কংগ্রেস সাহিত্যসংঘ প্রকাশনী—১

জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজির অর্থনীতি

শ্রীঅনাথ গোপাল সেন

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

৯ই আগষ্ট ১৯৪৫

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

অর্থনৈতিক স্বার্থ লইয়া রাজনৈতিক সংঘর্ষ আগ্নেয়-গিরির মত দিকে দিকে উৎসারিত হইয়া বিশ্বময় মৃত্যু ও ধ্বংস ছড়াইতেছে। মোহান্ধ ভীত জীব অপরকে দলিয়া পিষিয়া নিজে বাঁচিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহারই ফলে দলগত ও জাতিগত স্বার্থ লইয়া পুরাতন পথ ও আদর্শের সহিত নূতন পথ ও আদর্শের সংঘর্ষ বাধিয়াছে—পুরাতন ক্যাপিটালিজ্‌ম ও লিবারেলিজ্‌ম-এর সঙ্গে ফ্যাসিজ্‌ম ও সোশ্যালিজ্‌ম-এর আবির্ভাব হইয়াছে। স্বাধীন দেশের জহ্লাদ গুরুদেবরা দেশবাসীকে নিজ নিজ "ইজ্‌ম"-এর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া "মার অরি পার যে কৌশলে" আদেশ দিয়া রণাঙ্গনে পাঠাইতেছেন। আর আমাদের পরাধীন দেশের স্বাধীন অধিবাসীরা সর্বপ্রকার 'ম'কার আমদানী করিয়া মহোল্লাসে স্লোগানের কণ্ঠাস্ত্রে শত্রুনিপাত করিবার ছলে আত্মকলহ সৃষ্টি করিতেছেন।

'চারি 'ম'কারের স্বরূপ বর্ণনা ও তাহাদের পটভূমিতে অর্থনৈতিক গান্ধীজ্‌ম-এর পরিচয় এই পুস্তকের বিষয়বস্তু। আধুনিক যুগের দুরারোগ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার-বিধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনাথবাবুর অননুকরণীয় অনবদ্য লেখনীর গুণে কিরূপ রস-সাহিত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহার পরিচয় পাঠকবর্গ আবার নূতন করিয়া এই পুস্তকে পাইবেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি।

৯ই আগষ্ট এই স্মরণীয় দিনে পুস্তকটি প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগকে সকল ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদটি এই সঙ্গে দেওয়া সম্ভবপর হইল না। তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। যাহা হউক সঙ্গীয় স্লিপটি উপস্থিত করিলেই ক্রেতাগণ এই দ্বিতীয় খণ্ড বিনামূল্যে পাইবেন। নিবেদন ইতি—

৯ই আগষ্ট, ১৯৪৫।

সূচীপত্র

জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজির অর্থনীতি

জাগতিক পরিবেশ

এইসব বিষয়ে আমাদের ধারণা বেশ কিছু ঝাপসা। তাহার কারণ আছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক ব্যাপারের মারপ্যাঁচ আমরা বিশেষ বুঝি না, বুঝিবার চেষ্টাও এতকাল করি নাই। ইংরেজের গড়া আইন-আদালতে ওকালতি করিয়া, বিলাতী ঔষধের এজেন্সি পাইবার সনদ লইয়া ডাক্তারি করিয়া, নয়তো বিদেশী প্রভুদের চাকুরি করিয়া, 'হরি হে তুমিই সত্য' দুই বেলা এই মন্ত্র জপ করিয়া এ দেশের কৃষ্ণচরণ রাধাকান্তের জীবন একপ্রকার ভালই কাটিয়াছে। জুজুৎসুর প্যাঁচের মত অর্থনৈতিক এক প্যাঁচেই মানুষ যে চিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে পারে এবং আর এক প্যাঁচে দাঁড়াইতে পারে, সেই জ্ঞান তখনও হয় নাই,—তাই মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনও বোধ করি নাই। দ্বিতীয়ত, পায়ের বেড়ি সম্বন্ধে যেদিন আমরা প্রথম সজাগ হইলাম, সেই দিন স্বাধীনতার সংগ্রামটাকেই আমরা বড় করিয়া দেখিলাম, স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে পূর্ব হইতে চিন্তা করা অনাবশ্যক মনে হইল। তৃতীয়ত, অর্থ-নৈতিক মতবাদের গুরুত্ব বিগত মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়া রুশিয়ায় সমাজতন্ত্র এবং ইটালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববাসীর তেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যে ভয়াবহ বিপ্লবের মধ্য দিয়া এই সব রাষ্ট্রের পতন ও উত্থান সংসাধিত হয়—বিশেষত

রুশিয়ায় ও জার্মানিতে—তাহার মূল কারণ যে অর্থ-নৈতিক মতবাদেরই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য সংঘর্ষ, উহা তখনই আমরা প্রথম জানিতে পারিলাম ; কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিতে ঠিক পারিলাম না। কারণ সেই সময়ে ঐ সব দেশের ভিতরে চলিয়াছে স্বৈরাচার এবং বাহিরে চলিয়াছে—শত্রুপক্ষের মিথ্যা-প্রচার। সত্য তখন আহত ও আচ্ছন্ন। চতুর্থত, যে মহাপুরুষ আজ ২৫ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল সত্য ও অহিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন তিনি জানিতেন যে, বিশেষ কোন অর্থ-নৈতিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের প্রশ্ন তখনও উঠিতে পারে না। সেই প্রশ্ন উত্থাপন করার অর্থই হইল—অসময়ে অকারণে এ দেশে শ্রেণী-সংঘর্ষের সৃষ্টি করা এবং যেখানে সকল শ্রেণী একই স্বার্থবোধ ও আত্মসম্মানজ্ঞান হইতে একসঙ্গে স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজ নিজ ভাবে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, সেইখানে অর্থ-নৈতিক তত্ত্বকথার ধূলিজাল বিস্তার করিয়া সেই সংহতি ও সঙ্ঘবদ্ধতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া। তিনি আরও জানিতেন যে, তিনি যে অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার ধারক, তাহার স্বরূপ ও সার্থকতা বুঝিবার সময় তখনও আসে নাই। কারণ, যাঁহারা তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র ও ত্যাগের জন্য তাঁহার প্রতি অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই এই পরিকল্পনাকে গান্ধীজীর মধ্যযুগীয় (কু)সংস্কারপ্রীতি বলিয়া মনে করিতেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁহাকে মনপ্রাণ দিয়া সমর্থন করিতে পারিতেন না। আজ স্বীকার করিতে বাধা নাই, লেখকও তাঁহাদেরই একজন ; কিন্তু এখন মনে হয়, ২৫ বৎসর পূর্বে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানেই

তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নয়—(উইল্‌সন-লয়েড জর্জ-ক্লিমেনসোর বিশ্ব-স্বাধীনতার চৌদ্দ দফা সনদ এবং লীগ অব নেশন্‌স সত্ত্বেও), আরও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শীঘ্রই আসিতেছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার শিল্পবিভব-উদ্ভাসিত অমরাপুরী, যাহা আমাদিগকে পতঙ্গের মত ঐ একই দিকে দুর্বার আকর্ষণে টানিতেছে, তাহার ভয়াবহ বিনাশ অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথ, রোম্যাঁ রোলাঁও গত বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের স্বরূপ দেখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর সমস্ত আস্থা হারাইয়াছিলেন এবং বিশ্বের মানবকে আহ্বান করিয়া উদাত্ত স্বরে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—যদিও দুঃসাহসিক কোন পরিকল্পনা লইয়া পাশ্চাত্য শক্তি ও সভ্যতার বিরুদ্ধে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। এই দুঃসাহসিক যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন গান্ধীজী। যে পথ উনবিংশ শতাব্দীকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-বিভবে মণ্ডিত করিয়া মহাগৌরবে আনিয়া বিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিল, সেই পথের ধারে এক অর্ধনগ্ন দুর্বল কৃশ ফকির হাঁক দিয়া দাঁড়াইল, halt, তিষ্ঠ—সম্মুখে সর্বনাশ!

লোকটা বলে কি! থামাও তোমার কল; বন্ধ কর তোমার সব বড় বড় কারখানা, লক্ষ লক্ষ লোককে পথে বসাইয়া, অমানুষ করিয়াও তোমাদের ক্ষুধা মিটে নাই, তাই আজ তোমরা পৃথিবীব্যাপী গলিত লৌহ ও অগ্নি বর্ষণ করিয়া, সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছ শত্রু-বিনাশের নামে। আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, ঐ পথে যাইবার দরকার নাই, ঘরে বসিয়া স্থির মনে চরকায় সূতা কাট, খদ্দর পর, স্বাবলম্বী হও,—পরের সেবা পারতপক্ষে গ্রহণ করিও না, পল্লী ও কুটীরশিল্পের দিকে নজর দাও, বৃত্তিমূলক আত্মপুষ্ট

সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা কর, সেই শিক্ষার ভিতর দিয়া গ্রামের সেবা কর, মাদকদ্রব্য পরিহার কর, অস্পৃশ্যতা বর্জন কর, সত্য ও অহিংসার উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠা কর—সব সমস্যা সহজ হইয়া যাইবে।

তত্ত্বের দিক দিয়া তিনি কোন সূত্র বা 'ফরম্যুলা' প্রচার করিলেন না, আর্থিক পরিকল্পনার একটি পরিপূর্ণ রূপও প্রকাশ করিলেন না, কিংবা সবগুলি কর্মকে একত্র গ্রথিত করিয়া উহা আমাদিগকে রাজনীতি বা অর্থনীতির পরিচিত কোন্ লক্ষ্যস্থলে লইয়া যাইবে, তাহাও কোন থিওরিষ্টের মত ব্যাখ্যা করিয়া খুলিয়া বলিলেন না। অর্থাৎ তাঁহার সমগ্র পরিকল্পনাটিকে লইয়া আমরা তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাইলাম না। অংশবিশেষকে লইয়া যাহা পাইলাম, তাহাও সংক্ষিপ্ত এবং সূক্ষ্ম ও তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রভায় এতটা উজ্জ্বল যে, অনেক সময় তাহা না বুঝিয়াও বুঝিয়াছি মনে করিলাম।

কিন্তু আজ মনে হয়, তাঁহাকে বুঝিবার মত আলো তিনি না দিলেও, অন্য দিক হইতে তাহা আসিতেছে। তিনি সম্ভবত জানিতেন, এই দিক হইতে আলো আসিবে—তাই থিওরি গড়িয়া প্রচারের জন্য ব্যস্ত হন নাই, সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন। মন দ্বারা গড়া কিংবা বুদ্ধি দ্বারা তৈয়ারি 'থিওরি'কে প্রতিষ্ঠার জন্য আঁধারের ষড়যন্ত্র, পাশবিক বলপ্রয়োগ ও ক্রূর হিংসার প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিংবা প্রতিপক্ষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য বুদ্ধির ভোজবাজিও দেখানো যাইতে পারে; কিন্তু ইহা গান্ধীজীর নীতিও নয়, পথও নয়। তাই সমগ্র জাতির কলঙ্ককর ব্যর্থতা সত্ত্বেও,

তাহার নিবিড় বেদনা নীরবে সহিয়া, সকলের দুঃখ-দহন বুকে করিয়া তাঁহাকে সাধনা করিতে হইয়াছে, অসীম ধৈর্যে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে প্রভাতের আলোর জন্য। যে কথা গান্ধীজী আমাদিগকে বলেন নাই, কিংবা বলিলেও আমরা বুঝিতে পারি নাই বা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাহা যেন আমাদের সম্মুখে ধীরে ধীরে আজ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে মানুষের চেষ্টায় নয়, বিধাতার বিধানে—by process of elimination, নেতি নেতি পন্থায়। ক্যাপিটালিজ্ম, ফ্যাসিজ্ম, এমন কি আমাদের বড় আশার সোশ্যালিজ্মের স্বরূপ যখন এই মহাযুদ্ধে আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, তখন ইহাদের মাধ্যমে মানবজাতির পরিত্রাণের যে কিছুমাত্র আশা নাই, তাহা আবার যেন ভাল করিয়া বুঝিলাম। যে সূর্য মধ্যাহ্ন-গরিমায় পাশ্চাত্য গগনে এতকাল কিরণ বিকিরণ করিতেছিল, তাহা যেন আজ সত্য সত্যই পশ্চিম-আকাশে অস্তগমনোন্মুখ। জার্মানি ও জাপান-বিজয় দ্বারা এই সঙ্কট হইতে ইঁহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবেন না। মূল ব্যাধি যে আরও অনেক গুরুতর ও পাশ্চাত্য চিকিৎসার অতীত, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি দ্বারাও ইহা আর অস্বীকার করিতে পারা যাইতেছে না, এবং গান্ধীজীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথও আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

সেইজন্যই কংগ্রেসের অর্থ-নৈতিক দৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এখন আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের ও গান্ধীজীর অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী একপ্রকার অভিন্ন। কারণ গান্ধীজীই কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা। কংগ্রেসের ভিতরে ক্যাপিটালিষ্ট,

ফ্যাসিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, সকল মতাবলম্বী লোকের স্থান থাকিলেও তাঁহাদের প্রভাব গৌণ ও সামান্য। এখানে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অর্থ-নৈতিক গান্ধীবাদ এক দিকে যেমন মূল গান্ধীবাদের একটা দিক্ বা অংশ মাত্র, অন্য দিকে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত গান্ধীবাদ হইতে তাঁহার অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা পৃথক একটা বস্তুও নহে। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক দৃষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি গান্ধীবাদের অর্থ-নৈতিক দিকটাই আলোচনা করিব, গান্ধীবাদের মত বিরাট ও ব্যাপক দার্শনিক তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্যও নহে, সাধ্যও নহে।

বর্তমান সময়ে শক্তিশালী পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে যে তিনটি অর্থ-নৈতিক তত্ত্ব বা 'বাদ' লইয়া রাজনৈতিক বিপ্লব চলিয়াছে, তাহারা ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিষ্টতন্ত্র নামে পরিচিত। প্রথমটির বাহক তথাকথিত ডিমক্রেসি ; দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির বাহক ডিক্‌টেটর্‌শিপ। এই তিনটিই নিজ নিজ বিশিষ্ট অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে ব্যগ্র। এই তিনটির সহিতই গান্ধীবাদের গুরুতর মূলগত প্রভেদ থাকিলেও, দ্বিতীয়টির, অর্থাৎ মার্ক্‌সপন্থী সমাজতন্ত্রের, সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে বলা যাইতে পারে—বিশেষভাবে দুর্গত ও বঞ্চিতদের উদ্ধার সম্বন্ধীয় লক্ষ্য সম্পর্কে। এইজন্যই ইহাকে সংক্ষেপে "গান্ধীয়ান সোশ্যালিজ্‌ম" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে—যদিও "মার্ক্‌সীয়ান সোশ্যালিজ্‌ম"-এর অনেক অনুরাগী ভক্ত ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া থাকেন এবং ইহা দ্বারা 'তাঁহাদের সোশ্যালিজ্‌ম'কে অপমান করা হয় মনে করেন। অন্য দিকে আর এক শ্রেণী, গান্ধীজী দেশের বণিক-সম্প্রদায়ের সহিত

এখনই বিরোধ বা সংঘর্ষ উপস্থিত না করিয়া তাহাদের অনেকের সহিত কেন প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ বা সংস্রব রাখিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে দোষারোপ করিয়া থাকেন—এমন কি তাঁহাকে ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক পর্যন্ত মনে করেন। যাঁহারা এইরূপ ভাবেন, তাঁহারা মহাত্মার জীবনের মূলমন্ত্র 'সত্য' ও 'অহিংসা'-র কথাই ভুলিয়া যান এবং মতান্তর হইলেও কাহারও সহিত তাঁহার যে মনান্তর বা সম্প্রীতির অভাব হইতে পারে না, তাহা ইঁহারা ভাবিতেও পারেন না। বলা বাহুল্য, ইহা অপেক্ষা অধিকতর অসত্য অপবাদ গান্ধীজী সম্বন্ধে আর কিছু হইতে পারে না। তাঁহার সমস্ত উন্মুক্ত জীবনখানাই এইরূপ ধারণার মূর্তিমান প্রতিবাদ। দরিদ্রের এত বড় বন্ধু পৃথিবীতে বেশি জন্মায় নাই। সর্বপ্রকার অবিচার-অনাচারের এত বড় সত্যাশ্রয়ী বিদ্রোহী ইতিহাসে বিরল; দেহের ও আত্মার, ব্যষ্টির ও সমষ্টির, দেশের ও জাতির, সকল রকম পরাধীনতার বিরুদ্ধে শান্তি ও অহিংসার পথে এত বড় মুক্তি-সংগ্রাম পূর্বে আর কেহ পরিচালনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে তিনি Round Table Conference-এ যে অবিস্মরণীয় অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, তিনি কোন্ অর্থনৈতিক স্বার্থের ধারক ও বাহক।—

"The Congress represents in its essence the dumb and semi-starved millions scattered over the length and breadth of the land in its seven lakhs of villages. Every interest which is worthy

of protection has to SUBSERVE to this interest and if there is genuine and real clash, I have no hesitation in saying that THE CONGRESS WILL SACRIFICE EVERY INTEREST FOR THE SAKE OF THE INTEREST OF THE DUMB MILLIONS."

দৃষ্টান্ত ও অনুষ্ঠান অপেক্ষাও যাহাদের নিকট বাক্যের মূল্য অধিক, আশা করি তাহারাও ইহার পর মহাত্মাজী ও কংগ্রেসের নিকট কাহার স্বার্থ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সর্বাগ্রে রক্ষণীয় তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় করিতে পারিবেন না। তাঁহার গঠনমূলক কার্য প্রণালীর গোড়ার কথাই এই আর্থিক সাম্যবাদ। এই বিষয়ে তিনি কতদূর অবহিত এবং তাঁহার মতবাদ কিরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই কথাগুলি হইতেও আমরা বুঝিতে পারিব ঃ

"The whole of this (constructive) programme will however be a structure on sand if it is not built on the solid foundation of economic equality."

এই সম্পর্কে আরও একটি ক্ষুদ্র অথচ বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্বে ভারতের আটজন শ্রেষ্ঠ ধনী শিল্পপতি এ দেশে শিল্পপ্রসারের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রকাশ করিলে তাহা লইয়া চারিদিকে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অনেকে ইহাকেই "যুদ্ধোত্তর জাতীয় পরিকল্পনা"-রূপে গ্রহণ করিয়া জাতীয় মুক্তির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠেন। যাঁহারা এই পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা গান্ধীজীর মতাবলম্বী বা পথাবলম্বী না হইলেও, তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার অনুরক্ত বা বন্ধুস্থানীয়। এবার বন্দী দশা হইতে মুক্তিলাভের পর

গান্ধীজী যখন বোম্বাইয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই পরিকল্পনার প্রতি তাঁহার মনোভাব এবং আশিস্ যাচ্ঞা করা হইলে তিনি যে সংক্ষিপ্ত জবাবটি দেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"I am not at all interested in the matter. What I am immediately concerned with is the amelioration of the condition of the suffering masses of India."

যে বোম্বাই পরিকল্পনা লইয়া আমাদের দেশে এত মাতামাতি, পণ্ডিত-মহলে এত গবেষণা, এমন কি অ্যাংলো-আমেরিকার সরকারী ও ধনী মহলে পর্যন্ত নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে, এইরূপ একটা বিষম ব্যাপারকে কিনা গান্ধীজী সামান্য দুইটি কথায় শেষ করিয়া দিলেন! কিন্তু এই অতি সংক্ষিপ্ত কথা দুইটির মধ্যে কি বজ্রগর্ভ দৃঢ়তা ও উভয় আদর্শের কত বড় পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে!* ইহার পরও কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে যে, গান্ধীজী অপেক্ষা আধুনিক ধনতন্ত্রের ও বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের বড় শত্রু আজ দুনিয়ায় আর কেহ নাই? পাইকারী গৃহদাহ ও পাইকারী নরহত্যার যে খুন মানুষের মাথায় আজ চাপিয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে ধনতন্ত্রকেই শুধু নয়, বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পকেও কিছুকালের জন্য বাদ দিতে হইবে—ইহাই গান্ধীজীর, তথা কংগ্রেসের প্রথম ও প্রধান অর্থনীতি মনে করা যাইতে পারে।

*আরো কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গান্ধীজীর নিজ ভাষায় তাঁহার স্বরাজের ব্যাখ্যা দিতেছি: "Swaraj for me means freedom for the meanest of our countrymen. I am not interested in freeing India merely from the English yoke. I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever. I have no desire to exchange 'king log for king stork'."

যাঁহারা Capitalism ও Industrialisation ভিন্ন দেশের আর্থিক উন্নতি ও সাংস্কৃতিক প্রগতি কল্পনা করিতে পারেন না, তাঁহারা দেশ বলিতে বিদেশী আমলাতন্ত্রের সৃষ্ট ও পৃষ্ঠপোষিত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত 'ভদ্র' শ্রেণীকে অর্থাৎ আপনাদিগকে বুঝিয়া থাকেন, ইহার বাহিরে যে ৩৫ কোটি দেশবাসী মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়া আছে তাহাদের কথা কল্পনাও করিতে পারেন না এবং নিজেদের দালালি ও চাকুরি লাভের সুযোগ-সুবিধা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলেই দেশের মোক্ষলাভ হইল মনে করেন। সেই কারণেই আমরা যখন কোন অর্থ নৈতিক সমস্যার আলোচনা করি, তাহা শোষকদের অর্থশাস্ত্র হইতে ধার-করা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া করিয়া থাকি এবং স্থান-কাল-পাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ অবাস্তব আলোচনা অন্ধ পরানুকরণে আমাদের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা যুগপৎ একটি হাস্যকর ও বিয়োগান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এত বড় দৃষ্টিহীন, হৃদয়হীন সম্প্রদায়, এই ভদ্র মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মত, কল্পনা করাও কঠিন। ইহাদের অপরাধ আরও অমার্জনীয় এইজন্য যে, ইহারাই আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার ও পদমর্যাদার আভিজাত্য লাভ করিয়া নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা, শঠতা, ছলচাতুরি ও দেশদ্রোহিতাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাহ্য পোশাকে সর্বাঙ্গের মহারোগ ঢাকিয়া ইহারাই আধুনিক বিদগ্ধ-সমাজের সম্মানী মনুষ্য। যাঁহারা এত উচ্চে এখন পর্যন্ত উঠিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছেন, সুযোগ পাইলেই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন। কয়েক সহস্র যুবকের আত্মত্যাগ এবং আত্মবিলোপ এই সম্প্রদায়ের স্বজাতিদ্রোহিতা ও মানবদ্রোহিতার দুরপনেয় কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিতে

পারে নাই। তবে আশার কথা এই যে, ঝুটা আভিজাত্যের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে—যদিও যুদ্ধশেষের লক্ষণ দেখিয়া ইঁদুরের গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসিবার সুযোগ পাওয়ামাত্রই ইহারা দুঃস্বপ্নের মত আশঙ্কটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহারা ভুলিতে চাহিলেও, মহাকাল ইহাদিগকে ভুলিবে না। কারণ ধনতন্ত্রের তরী যতদিন ভাসিয়া থাকিবে ততদিনই তাহাকে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ডুবো জাহাজ, ব্যোমযান, বিষ, গ্যাস ও বোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া ভাসিয়া থাকিতে হইবে এবং বর্তমান যুদ্ধে যদি শেষ পর্যন্ত বিষ ও গ্যাসের ব্যবহার না-ও হয়, তৃতীয় যুদ্ধে সম্ভবত কোন অস্ত্রই বাদ পড়িবে না এবং তখন মনু-বংশে বাতি দিবার প্রাণী খুব বেশি থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা শুধু আমাদেরই কাল্পনিক আশঙ্কা নহে, অনেক পাশ্চাত্য মনীষী এই সম্বন্ধে চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। শান্তিপ্রিয় পণ্ডিতদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, ফিল্ড-মার্শ্যাল স্মাট্স-এর ন্যায় প্রবীণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ মহারথী পর্যন্ত সম্প্রতি বলিয়াছেন : "Unless some way is found which renders war obsolete, which will eliminate it from the course of human progress, the future is dark beyond measure". তাঁহার মত লোকও কোনও পথের নির্দেশ দিতে পারেন নাই। পারিবেন কেমন করিয়া, তাঁহাদের শাস্ত্রে কোন পথ থাকিলে তো।

ধনতন্ত্রের মজ্জাগত অন্তর্বিরোধ ও যুদ্ধের অনিবার্যতা

ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব পাশ্চাত্য সমাজকে আজ এমন একটা বিসদৃশ অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে যে, তাহাদের এই বিরাট যন্ত্রদানবের রাক্ষসী ক্ষুধা মিটাইতে হইলে, ধনী-সম্প্রদায়ের ঠাট বজায় রাখিতে হইলে, যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ যুদ্ধ বেশি দিন বন্ধ থাকিলেই যন্ত্রদানবকে উপবাস করিতে হইবে, ধনীদের লাভের কড়িতে টান পড়িবে—কারণ শান্তি-পর্বের ভোগের পণ্য মাত্র সৃষ্টি করিয়া ইহাদের অনির্বাণ জঠরানল নিবারিত হইবে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা আজ এমনই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে যে, আমরা শান্তি চাহিব, কি যুদ্ধ চাহিব, তাহাও ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না—কারণ যুদ্ধ ও শান্তি দুইই আমাদের পক্ষে সমান মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি-পর্বে বেকার ও ব্যবসা-মন্দার সমস্যা—চারিদিকে প্রচুর ভোগৈশ্বর্য, অথচ স্পর্শ করিবার উপায় নাই,—দুঃসহ অর্থাভাব, যাহার জ্বালায় কবে আর একটা লড়াই বাধিবে বলিয়া আমাদিগকে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। আবার লড়াই যখন বাধে, তখন পণ্যসম্পদের তিরোধান, কিন্তু অর্থের ছড়াছড়ি, সব থাকিয়াও কিছুই নাই—অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, এমন কি মাথা গুঁজিবার সামান্য স্থানটুকুর পর্যন্ত অভাব। শান্তির সময় যন্ত্রদানব মানুষের ভোগের জন্য যে অপূর্ব সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছিল, কর্মাভাবে, অর্থাভাবে তাহার সামান্যই সে ভোগ করিতে পারিয়াছিল। আবার যুদ্ধের সময় নরহত্যার কার্যে সাহায্য করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থলাভ যখন তাহার ভাগ্যে ঘটিল, তখন সে

দেখিল, ভোজবাজির মত সেই সব ঐশ্বর্য কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে, এবং কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি তাহাকে বিনাশের মধ্য দিয়া আদিম ও বর্বর যুগে পাঠাইবার জন্য প্রাণপণে ঠেলিতেছে। তাই আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে: War brings scarcity and inflation, peace brings unemployment and depression. Which of the two evils are we to prefer? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার আবশ্যক হইবে না; কারণ আমরা শান্তি বা যুদ্ধ যাহাই চাহি না কেন, **ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতা যতদিন আছে, ততদিন যুদ্ধের পর শান্তি এবং শান্তির পর যুদ্ধ পর্যায়ক্রমে চলিতেই থাকিবে এবং প্রত্যেক বারই অবস্থা সঙ্গীন হইতে সঙ্গীনতর হইবে।** তবে আশার কথা এই যে, ধ্বংসবিজ্ঞান আজ এরূপ রোমাঞ্চকর নিপুণতা অর্জন করিয়াছে এবং শীঘ্রই আরও করিবে যে, এই অবস্থা আর বেশি দিন চলিবে না—তাহার পূর্বেই হয় মনুষ্যজাতি নিজেকে নির্মূল করিবে, নয়তো তাহাকে আমূল পথ পরিবর্তন করিতে হইবে।

ধনতন্ত্র-শাসিত যান্ত্রিক সভ্যতার ভিতরকার গলদ ও দুর্বলতা আজ এত সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার পরস্পরবিরোধী আত্মঘাতী হাস্যকর কার্যকলাপের মধ্য দিয়া যে, ধনবিজ্ঞানের পণ্ডিত না হইয়াও তাহা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়। তবু এখানে সংক্ষেপে দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহারা আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য ভিন্ন এক দিনও চলিতে পারে না এবং তাহারই নামে শপথ করিয়া থাকে। অথচ কাজের সময় তাহারা অন্য দেশ হইতে পণ্য ক্রয় করিবে না, কিন্তু অপর সকল দেশকে তাহাদের পণ্য

ক্রয় করিতে হইবে, ইহাই তাহাদের আশা ও দাবি। তাহার জন্য নানা রকমের ফন্দি-ফিকিরের অন্ত নাই। কেহ বিদেশী পণ্যের পথ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে আমদানী শুল্ক বসাইয়া উচ্চ শুল্ক-প্রাচীর খাড়া করিতেছে; কেহ বা স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যকে অর্থ-সাহায্য করিয়া বিদেশী শিল্পকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে; আবার কেহ তাহাতেও আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে, স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রামূল্য অস্বাভাবিক উপায়ে হ্রাস করিয়া দিয়া নিজ দেশের পণ্যমূল্য বিদেশের বাজারে সস্তা ও বিদেশী পণ্যমূল্য নিজের দেশে চড়া করিয়া দিয়া প্রতিপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ফলে ঘোরতর **জাতীয়তাবাদের চড়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতরী পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খাইয়া কাত হইয়া পড়িতেছে।** তদুপরি মুদ্রাবিনিময় ব্যাপার লইয়া একটা মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, অনেক দেশ গত যুদ্ধের ঋণ ও ক্ষতিপূরণ দিতে ফতুর হইয়াছে, এবং দুনিয়ার অধিকাংশ স্বর্ণতহবিল যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। ফলে বিশ্বের হাটে ইহাদের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়াছে এবং পৃথিবীর স্বর্ণতহবিলের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকিয়া নির্ধন জগৎবাসীর নিকট স্বর্ণের বিনিময়ে ধনী শিল্পপতিগণের পণ্য-বিক্রয়ের হাস্যকর প্রয়াস ব্যর্থ হইতেছে এবং জগদ্ব্যাপী ব্যবসা-মন্দার আবির্ভাব অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। আবার সত্যই যখন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, তখন ইহা প্রতিরোধ করিবার দোহাই দিয়া ইহারা মানুষের ভোগের সম্পদ আগুন জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিতেছে, নদীর জলে ভাসাইয়া দিতেছে, নয়তো মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতেছে! বিশ্বের কোটি কোটি দরিদ্র বুভুক্ষু নরনারীর মধ্যে তাহা দান করিবার পর্যন্ত উপায়

নাই; কারণ তাহা হইলে ব্যবসা-মন্দা বৃদ্ধি পাইবে, লাভের অঙ্ক আরও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে! এই ভাবে কত গম, কত তূলা, কত দুধ, ফলমূল এই সব পুঁজিপতিরা নিজ হাতে ধ্বংস করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! এত করিয়াও যখন ব্যবসা-মন্দা দূর হইতে চাহিল না, তখনই রব উঠিল পরবর্তী যুদ্ধ অতি সন্নিকট। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল, যন্ত্র-দানব আবার গরম হইয়া উঠিল, ব্যবসা-মন্দার মেঘ আস্তে আস্তে কাটিয়া যাইতে লাগিল। যাঁহারা ১৯৩০—১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারাই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য জাতিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া বৃথা—ইহাও একপ্রকার প্রবঞ্চনা বা আত্মপ্রতারণা। কারণ বাহ্যত এবং মুখ্যত যাহাদিগকে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হইতেছে, তাহারা অবস্থার দাস, নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং জার্মান জাতি বা হিটলার-গোষ্ঠিকে ভালরূপে শিক্ষা দিলেই মুশকিল আসান হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপই মনে করা হইয়াছিল, এবং বিশ্ব-শান্তির জন্য "লীগ অব নেশন্স"ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফল যাহা হইয়াছে, চোখের সম্মুখে এক জীবনেই তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

হইবেই বা না কেন? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লাভ বজায় রাখিতে হইলে সস্তায় কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতে হইবে; তাহার জন্য চাই অপর দেশের নৈসর্গিক সম্পদ। আবার কাঁচা হইতে রূপান্তরিত পাকা মাল বিক্রয় করিবার জন্য চাই তাঁবেদার দেশের হাট-বন্দর। সুতরাং পৃথিবীর নিরীহ দুর্বল শিকারগুলিকে লইয়া হিংস্র ও বলশালী শিকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। যদি বা কিছু সময়ের জন্য

জোড়াতালি দিয়া শিকারগুলিকে ভাগাভাগি করিয়া আপোসে শোষণ-ব্যবস্থা একটা করাও যায়, কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, উৎপন্ন পণ্যসম্ভার দরিদ্র শিকারগুলি কিছুতেই অর্থাভাবে ভোগ করিতে পারে না এবং পরিণামে তাহাদের এই অসহায় অসহযোগিতার জন্য বিশ্ব-মন্দার আবির্ভাব হয়। তখন অন্যায় ও জবরদস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ভাগবাটোয়ারাকে বাতিল কবিবার চেষ্টা শুরু হয় নূতন করিয়া গোপন অন্ধকারে, এবং শেষ পর্যন্ত আবার শক্তি পরীক্ষায়ই নামিতে হয় নূতন দল গঠন করিয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একটা দুষ্ট বৃত্তের মধ্যেই ইহাদিগকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাক খাইয়া মরিতে হইতেছে।

বিশ্ব-সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতিতে ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের দানকে কি তবে আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছি? নিশ্চয়ই না; ইহার অজস্র দানের কাছে আমরা সহস্র প্রকারে ঋণী, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিব না। যে যুগে ম্যাল্‌থাস-প্রচারিত অনুশাসন ছিল যে, মানুষের সংখ্যা ভোগের সামগ্রীকে শীঘ্রই বহুগুণ ছাড়াইয়া যাইবে এবং মানুষকে ভোগ্যবস্তুর অভাবে অকালে অনাহারে মরিতে হইবে, অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে যে যুগে মানুষের সমস্যা ছিল পণ্যাভাবের (scarcity-র) সমস্যা, সৃষ্টির সমস্যা, সেই যুগে ইহা সভ্যতার রথকে বায়ুবেগে উড়াইয়া আনিয়াছে, অভাবের (scarcity-র) সকল আশঙ্কাকে দূর করিয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান সমস্যা আর খাদ্য বা ভোগ্য বস্তুর অভাবের সমস্যা নয়; আজকার সমস্যা কর্মাভাবের সমস্যা, বেকার-সমস্যা; এবং এই সমস্যা সেই শিল্প-বিপ্লবেরই শেষ পরিণাম। ধনতন্ত্রের

উপর শিল্পবিপ্লব প্রতিষ্ঠিত না হইলে সমস্যা হয়তো এইরূপ দাঁড়াইত না; কিন্তু ক্রমবিবর্তনের স্বাভাবিক ধারায় ধনতন্ত্রকে ডিঙাইয়া সমাজতন্ত্র-প্রথায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার সম্ভব হয় নাই। যাহা হয় নাই, তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। যাহা হইয়াছে, তাহার ফলাফলই আমাদের বিচার্য।

সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব—তাহার সার্থকতা ও ব্যর্থতা

বৃহৎ কারখানার সাহায্যে ধনতান্ত্রিক প্রথায় বহুল উৎপাদনের ফলে এক দিকে পুঁজিপতিগণের সর্বময় কর্তৃত্বলাভ ও প্রফিটের সারাংশ গ্রহণ, এবং অন্য দিকে দেশময় স্বাধীন শিল্পী, কারিগর ও কৃষকদের বৃত্তিহীন বিত্তহীন অসহায় অবস্থায় দলে দলে শ্রমিক ও বেকারের দলপুষ্টি,—ইহা কার্ল মার্ক্স-এর চিন্তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে এবং তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি দ্বারা ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত কনট্রাডিক্শন্স অ্যাণ্ড ইনিকুইটিস প্রকাশ করেন এবং সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের মধ্যে বিশ্বের উৎপীড়িত ও বঞ্চিত সমাজের মুক্তিপথের নির্দেশ দেন। এই তত্ত্বের মধ্যে ইতিহাসের যে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আছে—যাহা economic or materialistic interpretation of history নামে খ্যাত—তাহার কথা ছাড়িয়া দিলে, ইহার সার কথা এই যে, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য কোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের মালিকী স্বত্ব থাকিবে না। বিশেষত যেসব সম্পত্তি হইতে খাজনা (rent), সুদ (interest), বা লাভ (profit) পাওয়া যায়, সেই সব সম্পত্তি

রাষ্ট্রের বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিবে কৃষক ও শ্রমিক সাধারণ। ধনিক বা অভিজাত সম্প্রদায় বলিয়া সেখানে কিছু থাকিবে না, এমন কি উচ্চ-নীচ কোনপ্রকার শ্রেণীবিভাগই থাকিবে না এবং সকলে সেখানে সমান মর্যাদা লাভ করিবে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া কোন কাজ না করিয়া, বসিয়া খাইবার সুযোগ-সুবিধা সেখানে কাহাকেও দেওয়া হইবে না। কৃষিকার্য বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে যে লাভ হইবে তাহা রাষ্ট্রের হাত দিয়া সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্ধনে এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধানে ব্যয়িত হইবে।

এই সোশ্যালিজ্‌ম পরিকল্পনায় বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয় নাই। বরং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের বিপ্লবের ফলে কার্ল মার্ক্‌সের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও পৃথিবীর অন্যতম বিপ্লবী লেনিন জার-তন্ত্রের আমূল উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবার পর তাঁহার অনুগামী উত্তরাধিকারীগণ ক্রমান্বয়ে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করিয়া যেরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ইহাদিগকে কার্যে পরিণত করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্পাদি সর্বক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সত্যই এক দিক দিয়া অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। বিজ্ঞান ও বৃহদাকার যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে সোশ্যালিষ্টদের সহিত ক্যাপিটালিষ্টদের কোন প্রভেদ নাই। উভয়ের মধ্যে মূলগত যে প্রভেদ তাহা হইতেছে এই যে, ক্যাপিটালিষ্ট-সম্প্রদায় পণ্য উৎপাদন করে সহস্র সহস্র শ্রমিকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, অর্থের বিনিময়ে তাহা বিক্রয় করিয়া নিজেরা লাভবান হইবার জন্য—প্রতিদানে শ্রমিকগণকে দিয়া থাকে যথাসম্ভব

স্বল্পপরিমাণ একটা নির্দিষ্ট মজুরি মাত্র। সোশ্যালিষ্ট প্রথায়, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—পুঁজিপতি বলিয়া কেহ নাই; পণ্যোৎপাদনের জমি ও যন্ত্র সবই রাষ্ট্রের; কর্ম করিয়া যোগ্যতানুযায়ী সকলকে সেখানে জীবিকা অর্জন করিতে হইবে। তাহার জন্য নিজ রুচি ও অভিপ্রায় অনুযায়ী সকলে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। শিক্ষার পর বেকার হইয়া অসহায় অবস্থায় কর্মেচ্ছু কোন ব্যক্তিকে বসিয়া থাকিতে হইবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত লাভ, ধনতন্ত্রের এই দুইটি মূল জিনিস সেখানে থাকিবে না, এবং এই ব্যবস্থায় যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা হইবে শ্রেণীহীন (classless), গণতান্ত্রিক (democratic) ও আন্তর্জাতিক (international)। তাহার আদর্শ হইবে, প্রত্যেকে তাহার সাধ্যানুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজনানুযায়ী সব পাইবে (From each according to his capacity and to each according to his needs)।

তত্ত্বের দিক দিয়া এই আদর্শ বৃহত্তর উপদ্রুত সম্প্রদায়ের নিকট অতিশয় লোভনীয় হইলেও, এমন কি সোভিয়েট রুশিয়া কার্যক্ষেত্রে নানা বিষয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের কল্পনাতীত উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইলেও, কালক্রমে অবস্থার চাপে পড়িয়াই হউক কিংবা ইহার বর্তমান সার্বভৌম নায়ক ষ্টালিনের মত-পরিবর্তনের দরুনই হউক, সোভিয়েট রুশিয়া কার্ল মার্ক্স ও লেনিনের আদর্শ হইতে এখন বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এতকাল ধনতন্ত্র যেখানে অর্থনৈতিক দাসত্বের মধ্যে রাজনীতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ প্রচার করিয়া আসিয়াছে, সেইখানে সোভিয়েট

রুশিয়া অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দান করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে একটা বহু-আকাঙ্ক্ষিত বৃহৎ নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহার প্রতিশ্রুত গণতন্ত্রকে একেবারে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। শ্রেণীবিহীন সমাজের যে লোভনীয় চিত্র সে বিশ্বের শূদ্রদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা ভোল বদলাইয়া নূতন আকারে আবার সেখানে দেখা দিয়াছে। "পৃথিবীর কৃষক-শ্রমিক, সব এক হও" ("workers of the world, unite") এই ছিল যে বিধানের প্রথম বাণী এবং ইহার শক্তির মূল উৎস, তাহা আজ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, এবং সেই স্থলে ঘোরতর জাতীয়তাবাদ সেখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিক 'জাতীয়' সঙ্গীতের বিলোপসাধন এই জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব এক প্রকার অনিবার্য। কারণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কিংবা অজুহাতে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করা ইহার স্বাভাবিক পরিণাম। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন স্থানের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্যও ওই একই প্রকার যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে এবং করাও হইতেছে।* আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রুশিয়া, এই ত্রিশক্তির

* বিলাতের "Observer" পত্রের মস্কো সংবাদদাতার এক সংবাদে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৪৪।২০ শে ফেব্রুয়ারী) তাহা পাওয়ার পলিটিকস্-এর অপরিহার্য পরিণামের উপরে প্রতিষ্ঠিত আশঙ্কাকেই পূর্ণ মাত্রায় সমর্থন করিতেছে।—After ridiculing suspicions of Russian expansions, Stalin proceeded in the same breath to explain that his policy was "dictated by Russia's strategic needs which require territorial and political readjustments in Eastern Europe." ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীরাও কিন্তু ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন,—পররাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিবার সময়।

মধ্যে পৃথিবীর ভাগবাটোয়ারার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা এখন পর্যন্ত যবনিকার অন্তরালে গোপন থাকিলেও তাহার খসড়া মানচিত্র সন্ধানী লোকেরা ইতিমধ্যেই খাড়া করিয়া ফেলিয়াছে। প্রভাব এলাকা (spheres of influence) নাম দিয়া অপর দেশ ও জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার অনাচারকে ইহারা যতই শোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করুক না কেন, এই যুগে তাহাতে আর কেহ ভুলিবে না। Spheres of influence-এর সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে power politics এবং তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশিয়া আছে, শাসন, শোষণ ও ষড়যন্ত্র এবং সর্বশেষে সর্বধ্বংসী সমর। ইংলণ্ডে তৈয়ারি কমন্‌ওয়েল্‌থের মুখোশ পরিয়া সোভিয়েট রুশিয়াকে তাহারই পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়া ইংরেজ-জাতি কিরূপ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, ১৯৪৪।৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া'র নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

"In fact, it appears that the Russians want to establish a 'Common-wealth' of Soviet Republics very much on the lines of the British Commonwealth of Nations. The British, who evolved the Commonwealth idea, may well regard the Russian proposal as a tribute."

অর্থনৈতিক সাম্যবাদ, যাহা সোভিয়েট রুশিয়ার সর্বপ্রধান কীর্তি, তাহাও ইতিমধ্যেই সেখান হইতে অনেকখানি বিতাড়িত হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যগণ পূর্বে পারিশ্রমিক বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করিতেন তাহা অতি সামান্য ছিল। কিন্তু সেই সীমানির্দেশ এখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এখন কম্যুনিষ্ট পার্টিভুক্ত বড় বড়

কারখানার ডিরেক্টারগণ যে বেতন পাইতেছেন, তাহা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কারখানার ডিরেক্টারগণের প্রায় সমতুল্য। সোভিয়েট রুশিয়ার মিত্র Wendell Wilkie-র *One World* পুস্তক হইতে রুশিয়ার একজন কারখানা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত তাঁহার কথোপকথনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

' "How does your pay as Superintendent of this factory compare with the pay of the average skilled worker in the plant ?" I asked him.

He thought for a moment : "It is about ten times as much."

That would be on the same ratio twenty-five or thirty thousand dollars a year in America, and actually was about what a man of similar responsibility in America would receive. So I said to him, "I thought Communism meant equality of reward."

Equality, he told me, was not part of the present Soviet conception of Socialism...' !

পার্টিভুক্ত শ্রমিকগণ সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা দশ গুণ বেশি মজুরি পাইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞগণের বেতন সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা আশি গুণ পর্যন্ত অধিক ! জনপ্রিয় লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রতি মাসে রয়্যাল্‌টি বাবদ ত্রিশ হাজার রুবল পর্যন্ত উপার্জন করিয়া থাকে। নির্ধারিত সীমার ঊর্ধ্বে অর্থ-সঞ্চয় সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। ফলে এই সব উচ্চ বেতন ও আয়ের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ইহারা এখন যথেচ্ছা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিতে পারে। পূর্বে সরকারী ঋণের জন্য সুদ দেওয়া হইত না ; এখন তাহার জন্য শতকরা ৭৲ টাকা হারে সুদ পাওয়া যাইতেছে ! মৃত্যুর পর সন্তানদের জন্য সঞ্চিত বা গচ্ছিত অর্থ

রাখিয়া যাইবার পক্ষে যে বাধা ছিল তাহাও এখন অপসারিত হইয়াছে। এইভাবে পুরাতন শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর স্থলে এক নূতন অভিজাত ও শাসক শ্রেণী ধীরে ধীরে সোভিয়েট রুশিয়ায় গড়িয়া উঠিতেছে।

১৯৪৩।৬ই সেপ্টেম্বরের 'টাইম' পত্র হইতে জানা যায় যে, বর্তমান সময়ে রুশিয়ার স্ত্রী-শ্রমিক ৬৬ ঘণ্টা, এবং পুরুষ-শ্রমিক ৮৪ ঘণ্টা (সপ্তাহে) কাজ করিয়া থাকে! বালকবালিকারা যুদ্ধের পূর্বে প্রাপ্তবয়স্করা যত ঘণ্টা কাজ করিত, তদপেক্ষা বেশি সময় কাজ করিতেছে।

শ্রমিক-প্রভুত্বের (dictatorship of the proletariat-এর) দোহাই দিয়া যেভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে, তাহা মহৎ লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়াও ক্ষমা করা কঠিন। 'কুলাক্স' নামে খ্যাত রুশিয়ার অবস্থাপন্ন কৃষকগণ তাহাদের জমি রাষ্ট্রের হাতে সমবায় রীতিতে চাষের জন্য ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদের মধ্যে ৫০।৬০ লক্ষ লোককে জি. পি. ইউ নামে পরিচিত গোয়েন্দা-পুলিসের হাতে প্রাণ হারাইতে কিংবা ভয়ঙ্কর রকমের শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টদলের যে সব প্রধান ব্যক্তি রুশিয়ার বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল, পাঁচ-ছয়জন ব্যতীত তাঁহাদের নির্মূল করা হইয়াছে! রাজনৈতিক দলাদলি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোট এক কোটি লোক হতাহত হইয়াছে অনুমান করা হয়! Max Eastman-এর ন্যায় সোভিয়েট রুশিয়ার অনুরাগী ও ভক্ত পর্যন্ত তাঁহার *Stalin's Russia and the Crisis in Socialism* পুস্তকে লিখিতে বাধ্য

হইয়াছেন ঃ "If the shedded blood of innocent men were measured, Stalin's would be a lake; Hitler's a duck-pond; Mussolini's could be dipped up by the tank carful". যে জার্মান গেষ্টাপো-পুলিসের আজ জগৎজোড়া এত দুর্নাম, তাহা রুশিয়ার জি. পি. ইউ.এর অনুকরণেই হিটলার গঠন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে হিটলার গুরু নহেন, ষ্টালিনের শিষ্য মাত্র।

সোভিয়েট রুশিয়ায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সহ-শিক্ষা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহার গুরুত্ব ধরা না পড়িলেও এই সংবাদের সঙ্গে যে টীকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সত্য হইলে বিষয়টিকে নিতান্ত সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পুরুষকে সৈন্য হইতে হইবে এবং নারীকে হইতে হইবে মাতা; সুতরাং পুরুষ ও নারীর শিক্ষা ও মনোবৃত্তি বিভিন্ন হওয়া দরকার, এই পুরাতন জ্ঞান তাহারা হঠাৎ নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইয়াছে। এই বিষয়েও হিটলার এবং ষ্টালিনের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কামানের খোরাক (Cannon fodder) যোগাইবার জন্য উভয় গোলার্ধ জুড়িয়া বিরাট 'রেজার্‌ভয়ার' যাহাদের নাই, বিশেষত দুই মুষ্টি অন্নের কাঙাল চল্লিশ কোটি লোকের বাস এই ভারতবর্ষ-রূপ কামধেনুর যাহারা মালিক নন, কামানের খোরাক তাহাদিগকে দেশেই তৈরি করিয়া লইতে হইবে। অবাধ প্রতিযোগিতার উপর যে সভ্যতার ভিত্তি—সহযোগিতার উপর নহে, 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতির উপর যাহার স্থায়িত্ব, পণ্যোৎপাদনের ন্যায় সন্তানোৎপাদনে প্রতিযোগিতা না করিয়া তাহাদের আর উপায় কি?

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বর্তমান রুশিয়াকে আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশ বলিতে পারি কি না! গণতন্ত্র, বিশ্বজনীনতা, শ্রেণী-বৈষম্যের অবিদ্যমানতা—এই তিনটি মূল আদর্শের মধ্যে কোনটির প্রতিই যখন তেমন নিষ্ঠা আর সেখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন ইহাকে সমাজতন্ত্র বলিব কিরূপে? ইহার কৃতিত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই কৃতিত্ব কার্ল মার্ক্স-প্রচারিত সমাজতন্ত্র-প্রথায় লাভ করা গিয়াছে কি না এবং গিয়া থাকিলেও তৎপর ইহার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে কি না, ইহাই এখন প্রশ্ন। এই প্রশ্ন আজ সমাজতন্ত্রের অসংখ্য ভক্তদের হৃদয়েও উদিত হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে সোভিয়েট রুশিয়ার অনুকূলে কেহ কেহ এই কথা বলিতে পারেন যে, সমাজতন্ত্রের আনুসঙ্গিক সমস্ত ফললাভ না হইলেও উৎপাদনের জমি ও যন্ত্রের উপর কাহারও ব্যক্তিগত মালিকী স্বত্ব থাকিবে না; এবং উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবসায়ের কোন লভ্যাংশ ব্যক্তি-বিশেষ পুঁজিপতি হিসাবে পাইবে না—সমাজতন্ত্রের এই গোড়ার উদ্দেশ্য যখন সাধিত হইয়াছে, তখন ইহাকে কেন সমাজতন্ত্র বলা যাইবে না? এইরূপ যুক্তির মধ্যে একটা ভুল আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহা হইতেছে এই যে, কম্যুনিষ্ট-দলের যেসব ডিরেক্টার আজ সোভিয়েট রুশিয়ার বৃহৎ কলকারখানা পরিচালনা করিতেছ, তাহারা পুঁজিপতিদের মত পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন কলকারখানার মালিক না হইলেও সমষ্টিগত-ভাবে দেশের সমগ্র কলকারখানা হইতে উৎপন্ন মোট লভ্যাংশের মোটা অংশীদার। তবে কি ইহাদিগকে ধনতন্ত্রী বলিতে হইবে? তাহাও বলা ঠিক হইবে না। State-capitalism নামকরণ ইহার করা যাইতে পারিত; কারণ যাহারা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে,

তাহারাই এই ধনতন্ত্রের প্রধান ফলভোগী। কিন্তু যেহেতু একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়া পুরাতন ধনতান্ত্রিক সমাজের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া ইহার আবির্ভাব হইয়াছে—সেহেতু ইহাকে State capitalism বলা সঙ্গত হইবে না। সনাতন পুঁজিপতি-দল আত্মরক্ষার জন্য ধীরে ধীরে যে পথে যাইতেছে, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে দাঁড়াইবে State capitalism। পরিচিত ও পুরাতন গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্র অপেক্ষা ইহা হইবে আরও মারাত্মক। কারণ ইহা সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরিয়া একনায়কত্বের জবরদস্তি লইয়া উপস্থিত হইবে। এই যুদ্ধ তাহার পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধের অজুহাতে গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য যে সার্বভৌম শক্তি অর্জন করিয়াছে, তাহা পরবর্তী কালেও থাকিয়াই যাইবে এবং Individual capitalism State capitalism-এ আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া সমাজতন্ত্র নামে আপনাকে চালাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং অ্যাংলো-আমেরিকার পথপ্রদর্শক ও গুরু হিসাবে পরবর্তী ইতিহাসে হিটলার ও মুসোলিনীর স্থান পাওয়া অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ম্যানেজারিয়্যাল ষ্টেট বা ম্যানেজার-রাজ

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক দৃষ্টি কিংবা অর্থনৈতিক গান্ধীবাদের যথার্থ মূল্য বুঝিতে হইলে আগে ক্যাপিটালিজ্‌ম, ফ্যাসিজ্‌ম প্রভৃতির স্বরূপ ভাল করিয়া বোঝা দরকার। সেইজন্য আমরা ক্যাপিটালিজ্‌মের বর্তমান স্বরূপ—তাহার মজ্জাগত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিরোধিতা এবং পরিণামে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সোশ্যালিজ্‌ম সম্পর্কীয় আলোচনায় ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সোভিয়েট রুশিয়া—ধনোৎপাদনের জমি ও যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের বিলোপ সাধন ও প্রফিট উপার্জনের পথ-রোধ করিয়া এক হিসাবে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া থাকিলেও অন্য দিকে মার্ক্‌স-এন্‌গেল্‌স-লেনিন-প্রতিশ্রুত শ্রেণীবিহীন গণতন্ত্র, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও অন্যান্য লক্ষ্যস্থল হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়াকে আদৌ সমাজতান্ত্রিক বলা সঙ্গত কি না, এমন কি ইহাকে ষ্টেট ক্যাপিটালিজ্‌ম বলিতে দোষ কি—তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ইহা State Capitalismও নয়, socialismও নয়—যদিও উভয়ের সহিতই ইহার কম-বেশি সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এইবার আমাদের প্রশ্ন হইবে, তবে কি ইহার নিজস্ব কোন গোত্র নাই? পরিচিত কোন গোত্রের মধ্যে যখন ইহাকে ফেলা যাইতেছে না, তখন ইহাকে গোত্রহীন বলা ভিন্ন আর উপায় কি? অবশ্য

কার্ল মার্ক্স অঙ্কের মত হিসাব কষিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, ধনতন্ত্রের বংশধর সমাজতন্ত্র ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না এবং এই সমাজতন্ত্রের হাতেই জরাজীর্ণ ধনতন্ত্রকে সব কিছু সমর্পণ করিয়া মহাপ্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু কার্যত তাঁহার এই ভবিষ্যৎবাণী আংশিক সফল হইয়াছে মাত্র। সমাজতন্ত্রের জন্ম হইয়াছে সত্য; কিন্তু হিসাবের ভুলে কিংবা জোরজবরদস্তির ফলে ইহা বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা আর সঙ্গত নয়। তাই বার্নহাম তাঁহার সুবিখ্যাত বইয়ে * ইহার নূতন নামকরণ করিয়াছেন—Managerial State। এই নামটি অনেকেই পছন্দ করিয়াছেন এবং আমাদেরও মনে হয়, লক্ষণ ও গুণ মিলাইয়া বিচার করিলে নামটি ঠিকই হইয়াছে। কারণ ইহার পরিচয়—এই নামেই একপ্রকার প্রকাশ পাইয়াছে।

আরও একটু খুলিয়া বলা যাক। সোভিয়েট রুশিয়ায় নামে শ্রমিক ও কৃষক-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও, কার্য্যত সমবায় কৃষি ও বৃহদাকার শিল্প উভয় ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্টপার্টির ম্যানেজার ও ডিরেক্টারগণেরই সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কৃষক ও শ্রমিকগণ হইয়াছে ইহাদের আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। সুতরাং রুশিয়ার জার সবংশে নিহত হইয়াও নূতন মূর্তিতে ক্ষুদ্র পরিধিতে প্রত্যেক ফার্মে ও ফ্যাক্টরিতে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন, এবং এইজন্যই বার্নহাম সোভিয়েট রুশিয়ার নামকরণ ম্যানেজার-রাজ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, সোশ্যালিষ্ট রেভোলিউশনের অবস্থা এরূপ

* *Managerial Revolution* by Burnham.

দাঁড়াইল কেন ? ইহার উত্তর বার্নহামই দিয়াছেন। তাঁহার মতে, জটিল ও অতি বৃহদাকার যন্ত্রের সাহায্যে বিরাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইলে অতি বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী একদল বিশেষজ্ঞ নায়কের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাদের সর্বময় প্রভাবও অনিবার্য। সেখানে সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের মতামতের বা আধিপত্যের কোন স্থান থাকা সম্ভব নয়।

রুশিয়ার ডিরেক্টার বা ম্যানেজারগণকে এক-একটি ক্ষুদে জার বলিয়া অভিহিত করা অত্যুক্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ যদি মনে করেন তাই Wendell Wilkie-র *One World* পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The manager was the Tsar of the farm. He planned the crops and directed the work. Every man, woman and child on the place was under his authority. ...The term 'liquidate' is constantly used in Russia. It can mean the accomplishment of a set task or it can mean imprisonment, exile or death for incapacity, failure or deliberate obstruction. I remembered an item from "Pravda" about the fate of the manager of a collective farm who had just been sentenced to 20 years' imprisonment, because one hundred cows had died on his farm. He had failed to liquidate the causes, so he himself had been liquidated."

কারণ এই সব ক্ষুদে জারের উপরেও একজন জার রহিয়াছেন, তিনি হইলেন জার শ্রেষ্ঠ ষ্টালিন। এই ক্ষেত্রে ম্যানেজার সাহেব যেমন নিজেই 'লিকুইডেটেড' হইয়াছেন, বহুক্ষেত্রে তিনি তেমনই অপরকে 'লিকুইডেট' করিতেছেন।

ভারতীয় সোশ্যালিষ্ট M. Masani-র *Socialism Reconsidered* পুস্তক হইতে খানিকটা বঙ্গানুবাদ দিতেছি ঃ—

"১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন সোভিয়েট রুশিয়ার ফ্যাক্টরিগুলি পরিদর্শন করি তখন এই সব ফ্যাকৃটরির উপর সত্যই শ্রমিকদের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই সব ফ্যাক্টরির অফিসে তখন দুইজন করিয়া ম্যানেজার বসিতেন। ইহাদের একজনকে ডিরেক্টার ও অপরকে রেড ডিরেক্টার বলা হইত। যিনি ডিরেক্টার, তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ টেক্‌নিশিয়ান; আর রেড ডিরেক্টারটি ছিলেন শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শ্রমিকদের বেতন, কাজের সময় ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে ইঁহার সম্মতি ভিন্ন কোনরূপ নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন পুনরায় রুশিয়া-ভ্রমণে যাই, তখন সেখানকার ফ্যাক্টরিতে আর রেড ডিরেক্টার দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম, তাহাদের পদ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মজদুরের গণতন্ত্র ইতিমধ্যে গতায়ু হইয়াছে। তৎপরিবর্তে তাহাদের মধ্যে রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে 'পিস ওয়ার্ক' প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে,—যাহাতে একে অপর অপেক্ষা বেশি সময় কাজ করিয়া কিংবা বেশি পরিশ্রম করিয়া অধিকতর অর্থ ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে।" ইহাই কি মজদুর-রাজত্ব—to each according to his needs? ধনতন্ত্রের মজুর চরানোর সহিত ইহার অনেকখানি সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে না কি?

আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য সোশ্যালিষ্ট রেভোলিউশন আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে ম্যানেজারিয়্যাল রেভোলিউশনে। বার্নহাম দাবি করেন, ধনতন্ত্রের পর ইহারই নাকি আসিবার কথা। এখানে সমাজতন্ত্রের সহিত ইহার প্রভেদ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার। উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের জমি ও যন্ত্রের উপর, বণ্টন ও বিনিময়-কারবারের উপর ব্যক্তিগত মালিকী-স্বত্ব লোপ পাইয়াছে এবং ব্যক্তিগত লভ্যাংশ প্রাপ্তির পথ বন্ধ হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই এই সব-কিছুর মালিক এখন রাষ্ট্র এবং ইহারা রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। এই পর্যন্ত মূল বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রভেদ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তখনই, যখন আমরা এই রাষ্ট্রের মালিক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা কে বা কাহারা, তাহার অনুসন্ধান করি। কোন কিছুর মালিক হওয়া আর তাহার উপর প্রভুত্ব করা সব সময়ে এক জিনিষ নয়। আইনত মালিক আমি হইলেও কার্যত প্রভুত্ব অপরের হাতে থাকিতে পারে। ভারতবর্ষের মালিক আমরা, ইংরেজও জগতে তাহাই প্রচার করিয়া বেড়ায়; কিন্তু কার্যত তাহারাই এ দেশের সর্বময় প্রভু। বাহ্যত ও আইনত সোভিয়েট রুশিয়ার মালিক দেশের শ্রমিক বা প্রলিটেরিয়েট সম্প্রদায় হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা কম্যুনিষ্ট-পার্টি নামক একটি দলের কঠিন শাসনাধীন। এই দলের পরিকল্পনা ও মতামতের বিরুদ্ধে রুশিয়ার কৃষক বা শ্রমিক-সাধারণের দাঁড়াইবার বা প্রতিবাদ করিবারও সাধ্য নাই, কম্যুনিষ্ট-পার্টি ভিন্ন অন্য কোন পার্টি গঠন করিবার অধিকার বা ক্ষমতা সেখানে কাহারও নাই।

পার্টির অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা সম্বন্ধে Maurice Hindus-

এর মত সোভিয়েট রুশিয়ার শুভানুধ্যায়ী লেখকও তাঁহার বিখ্যাত *Mother Russia* পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন ঃ—

"The Party is supreme and will tolerate no political opposition and no outside interference in any of its plans and programmes. Thus though Russia has won the battle of social and racial equality, the elevation of individual to a condition of political self-expression, with the right to criticise the dictatorship or to speak his mind freely and adversely of its leaders, is still a matter of the future." ষ্ট্যালিন নিজেই বলিতেছেন (১৯৩৯।১০ই মার্চের এক বক্তৃতায়), "Since our party is in power, they (Party members) also constitute the *commanding staff* of the leading organs of the State."

সমস্ত সম্পত্তি না হয় রাষ্ট্রের হইল ; কিন্তু তাহাতেই কি কৃষক-শ্রমিকদলের বাঞ্ছিত সোশ্যালিষ্ট স্বর্গ লাভ হইবে, যদি তাহারা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাই না পায় এবং তাহাদিগকে ধনতন্ত্র অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী, তুর্ধর্ষ ও বেপরোয়া একদল নূতন লোকের আজ্ঞাবহ দাসত্ব করিতে হয়—হউক না তাহা নিজেদের মঙ্গলের জন্যই ? অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা সত্ত্বেও একটা বিচারহীন আদেশানুবর্তিতার চাপে ইহাদের আত্মচেতনা ও মর্যাদাবোধ কি কালক্রমে একটা মূঢ় জড় অস্তিত্বে পরিণত হইবে না ? দলগত স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ ও আদেশের চতুঃসীমার মধ্যে বন্দী সাহিত্য ও শিল্প কি ইহাদের মনকে শাশ্বত আনন্দ ও মুক্তির বিরাট ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারিবে ? সাধারণ মানুষের উপর রাষ্ট্রের শক্তি বর্তমান যুগে এরূপ গভীর ও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ব্যক্তিগত জীবনের অন্তঃপুর পর্যন্ত আজ ভয়ঙ্কর রকমে আক্রান্ত।

উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে প্রায় সর্ব সময়ে সর্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কঠিন বন্ধন অক্টোপাসের মত সকল দুর্বল ও দরিদ্র জনকে আজ বেড়িয়া ধরিয়াছে। আমাদের দুর্গত মানবজাতির বহুআকাঙ্ক্ষিত মুক্তি সোভিয়েট রুশিয়া হইতে আসিবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, শিব গড়িতে গড়িতে তাহারা ইচ্ছামত মূর্তির রদবদল করিতেছে এবং ফলে সোশ্যালিষ্ট ষ্টেট ম্যানেজারিয়্যাল ষ্টেটে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কেন এরূপ ঘটিল, তাহার কারণ বার্নহাম দিয়াছেন এবং আমরা তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই ম্যানেজারিয়্যাল শাসনতন্ত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান হইল বটে, কিন্তু রাজনৈতিক শ্রেণীদাসত্ব ও বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের ঘূর্ণিপাকের বাহিরে থাকিবার কোন উপায় হইল না। ফলে সব পাইয়াও সব হারাইবার ভয়ে কঠোর শ্রম, রেষারেষি ও অপঘাত মৃত্যুর নিষ্ঠুর পথ তাহাদের জন্য পূর্বের মতই খোলা রহিল।

য়ুরোপে সোশ্যাল ডিমক্র্যাটদের দুর্বলতা—সোশ্যালিজ্‌মের পরাজয়—ফ্যাসিজ্‌মের আবির্ভাব

নিখুঁত সমাজতন্ত্রের মাপকাঠিতে সোভিয়েট রুশিয়ার বহু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আমরা আলোচনা করিলেও, সর্বনাশা ধনতন্ত্রের সর্বপ্রধান শত্রু হিসাবে যে ইহার আবির্ভাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই আবির্ভাব সমগ্র পৃথিবীর পুঁজিপতিদের চোখের নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছিল, এবং কিসে ইহাকে অপাংক্তেয় ও একঘরে করিয়া রাখিয়া অঙ্কুরেই ইহার বিনাশ-সাধন করা যায়,

তাহার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে ইহাদিগকে লিপ্ত করিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের শেষাঙ্কে রুশ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিবে বলিয়া লেনিন যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন—এবং যাহার জন্য প্রত্যেক দেশে একদল কম্যুনিষ্ট প্রস্তুত হইয়াই ছিল—তাহা তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও ক্ষিপ্রতার অভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল এবং প্রতিপক্ষ বেশ তৎপরতার সহিত অঙ্কুরেই এই দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে সমর্থ হইল।

"On November 7, 1919, Lenin said, 'Victory of Soviets all over the world is assured ; it is only a question of time.' But in 1921, the Soviet Revolutions in Europe were over. Not one of the Communist regimes outside of Russia survived. All were drowned in blood. Within a year Fascism reared its head in Italy."—*Mother Russia* by Maurice Hindus.

যে শক্তি ইউরোপের কম্যুনিষ্ট-দলকে পরাজিত করিয়া লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী ও আশাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, তাহাই ফ্যাসিষ্ট-শক্তি—ধনতন্ত্র-সমাজের দক্ষিণ ও বাম পন্থীর সম্মিলিত টোটালিটারিয়ান মূর্তি—সোভিয়েট রুশিয়ার প্রত্যুত্তর, ও ভার্সাই সন্ধির জবাব।

সোশ্যাল ডিমক্র্যাট নামীয় যে দল চেষ্টা করিলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে হয়তো সেই সময়ে শ্রমিক-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন, তাঁহারাও সেই সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। তাহা গ্রহণ করিবার মত সাহস, কর্মদক্ষতা, আদর্শ-নিষ্ঠা বা বিপ্লবী মনোভাব কিছুই তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের লক্ষ্য হইল শ্রমিকদের কতকগুলি ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধার, কর্মপন্থা হইল ট্রেড-ইউনিয়নিজম্ ও অনন্যোপায়ে ধর্মঘট, এবং শেষ ভরসা হইল "the inevitability of

gradualness"-তত্ত্ব। এমন কি রক্তহীন বিপ্লবের মধ্য দিয়া লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছিবার মত আদর্শ-নিষ্ঠা বা সাহসও ইঁহাদের নাই। আসল কথা, ইঁহারা শ্রমিকনেতা এবং শ্রমিকগোষ্ঠীর লোক হইলেও শ্রমিক ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন কিংবা ধনতন্ত্র ও প্রাইভেট প্রফিটের উচ্ছেদ অন্তর হইতে চাহেন না। কারণ দাসসুলভ মনোবৃত্তির দুর্বলতা ইঁহারা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই। এইজন্যই শ্রমিকদল হইতে প্রধান কিংবা অপ্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার অর্থ, তাঁহাদের নিজ গোয়াল পরিত্যাগ করা ও অপর গোয়ালে যাইয়া জাতে ওঠা। তাঁহাদের "inevitability of gradualness" অথবা এভোলিউশন থিওরির ইহাই অর্থ। তাই গত যুদ্ধের পর দোজ-হু-হ্যাভ-নটদের পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করিবার যে সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও ব্লুম দুইজনেই হেলায় হারাইয়াছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্যাপক ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিলে ট্রেড-ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভীত হইয়া পড়িলেন! যে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব গত মহাযুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধবিরোধিতার জন্য নানাভাবে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, আবার সেইজন্যই যুদ্ধান্তে জনপ্রিয়তার দরুণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ম্যাক্‌ডোনাল্ড এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিরূপ ধূর্ত পাকা সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় নূতন করিয়া এদেশে কাহাকেও দিতে হইবে না। কারণ তাহার বিষময় ফল আমরা আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। তুষারতুহিন শীতে, ছিন্নকন্থাবৃত হইয়া আলু-ক্ষেত চাষের দুঃস্বপ্ন যতদিন তাঁহার স্মৃতিপটে মুদ্রিত ছিল, ততদিন

তিনি বিশ্বের দরিদ্রবান্ধব সাজিয়া আমাদিগকে নানাভাবে ভুলাইয়াছিলেন, *Awakening of India* লিখিয়া আমাদের জন্য অনেক শোকাশ্রু ও সহানুভূতি বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনিই হিজ ম্যাজেস্‌টিজ গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী হইয়া ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার শূলে চড়াইয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, চিরপদানত করিয়া রাখিবার পাকা ব্যবস্থা করিয়া যান। যে ব্রিটিশ শ্রমিকদল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্মঘট করিয়া তাহার সহিত অসহযোগ করিবে বলিয়া প্রতি বৎসর যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই এবারকার যুদ্ধ শুরু হইলে তাহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবার জন্য তাঁহাদের কয়জন দলপতিকে চার্চিলের মত ঘোরতর দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী প্রধান মন্ত্রীর সহকারীরূপে ক্যাবিনেটে পাঠাইয়াছেন। ইংলণ্ডে শ্রমিক-নেতাদের এইরূপ ভোল বদলাইবার কারণ হইতেছে, ধনতান্ত্রিক প্রথায় সেখানে মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার গোড়ায় ইন্ধন যোগাইবার সুব্যবস্থা ; নেতা হইতে পারিলেই ইহাদিগকে পৈতা দিয়া অভিজাত-সম্প্রদায়ে কুলীন করিয়া তুলিয়া লইবার প্রথা। পুরাতন আভিজাত্যের প্রতি এরূপ মজ্জাগত মোহ ও দুর্বলতা পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সাধারণের এই মোহ ও দুর্বলতাই ধনী সম্প্রদায়ের দীন-দোহনের একটি গুপ্ত অস্ত্র, বা ট্রেড সিক্রেট। লেবার-ইউনিয়নে যাহারা কর্তৃত্ব করেন, তাঁহাদের একটা বেশ মোটা আয়ের ব্যবস্থা আছে ; সুতরাং দলগত অর্থ ও প্রভুত্বের সুবিধা-সুযোগ লাভ করিয়া সাম্রাজ্যবাদের মোটা মুনাফাভোগী সুখী পরিবারবর্গের আওতায় চলিয়া আসিতে ইহাদের আর বেশি বিলম্ব হয় না এবং তখন শ্রমিক-

সাধারণকে সাম্রাজ্যবাদের মহিমা বুঝাইবার জন্য অন্য লোক খুঁজিতে হয় না।

শ্রমিক-সাধারণের সর্বাঙ্গীণ আর্থিক নিরাপত্তা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কল্যাণ সাধনের জন্য ইংলণ্ডে 'বেভারিজ স্কীম' নামে যে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহাতে সাম্রাজ্যবাদের মহিমা বুঝিবার ব্যবস্থা অতি নিপুণ ও পরিপাটীরূপে করা হইয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে এই পরিকল্পনার শেষ সিদ্ধান্ত এইরূপ দাঁড়ায়ঃ হে স্বদেশী দরিদ্র-নারায়ণ! স্বর্গরাজ্য তোমাদের সম্মুখে—বেকারসমস্যা বা কোন সমস্যার ভাবনাই যুদ্ধের পর আর তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে না, তবে একটি মাত্র 'কিন্তু' বা শর্ত আছে। সেই সামান্য শর্তটি এই যে, দেশে বেকারসমস্যা যাহাতে ব্যাপকভাবে না আসে, তাহা তোমাদিগকে দেখিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে দেশের ধনীরা কোথা হইতে কেমন করিয়া তোমাদের এই স্কীমের জন্য ট্যাক্সের টাকা যোগাইবে? ভাষান্তরে ও আরও সংক্ষেপে ব্যাপারটা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইলঃ আর ভয় নাই, দেশে বেকারসমস্যা উপস্থিত না হইলে কোন প্রকারেই তোমাদের আর বেকার হইতে দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের অভাব আর কাহাকেও ভোগ করিতে হইবে না, যদি না দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব উপস্থিত হয়! ইহার পরও যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে উপায়? উপায় অতি সহজ। "হে ইংলণ্ডের শ্রমিকগণ! দুঃস্থ নিপীড়িত পরাধীন জাতির জন্য কখনও অশ্রু বিসর্জ্জন করিও না, আমাদের বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা, প্রয়োজন হইলে বৃদ্ধির জন্য, যুদ্ধে যাইতে, সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা স্থলে ৮৪ ঘণ্টা শ্রম করিতে এবং হাজারে হাজারে, লাখে

লাখে মানুষ হত্যা করিতে কখনও ইতস্তত করিও না, বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ লইয়া মস্তিষ্ক ঘামাইও না, দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব কিরূপে উপস্থিত হয় তাহা আমরা দেখিয়া লইব।"—ইহাই ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর শ্রমিক (বেভারিজ) পরিকল্পনার নিগূঢ় ভাবার্থ। সেই-জন্যই পার্লামেণ্টের সদস্য, শ্রমিকনেতা মিঃ শিন্‌ওয়েল ইংলণ্ডের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে "বামপন্থী সাম্রাজ্যবাদ"কে (Left wing imperialism-কে) তাঁহাদের দলের প্রধান নীতিহিসাবে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন! সাম্রাজ্যবাদের মহিমা কীর্তন করিয়া রক্ষণশীল-দল দেশের লোকের নিকট ভোটে জিতিয়া যাইবে, ইহা কি রকম কথা,—তাঁহারাই বা কম কিসে? তাই ইহা যে গণযুদ্ধ, পরাধীন জাতিগুলির মুক্তির যুদ্ধ, সকলকে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষের মত মাথা উঁচু করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে দিবার যুদ্ধ, তাহা প্রমাণ ও প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইংলণ্ডের শ্রমিক ও রক্ষণশীল উভয় দলই নাকি এবার এম্পায়ার শ্লোগান (সাম্রাজ্য চাই ধ্বনি) গ্রহণ করিয়া গণযুদ্ধ হইতে ভোট-যুদ্ধে নামিতেছেন। ইহার পরও যাঁহারা ব্রিটিশ শ্রমিকদল অথবা Social Democratic Party হইতে ভারতশোষণের প্রতিকার কিংবা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক মনোভাব প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা নিতান্তই দিবাস্বপ্ন দর্শন করিতেছেন সন্দেহ নাই। মাঝে মাঝে ঐ-তরফ হইতে যে সব সুমিষ্ট বচন শুনিয়া আমরা পুলকিত ও কৃতার্থ হই, তাহাও আমাদের ভগ্ন হৃদয়কে নিখরচায় জোড়া দিয়া রাখিবার একটি রাজনৈতিক কূট-কৌশল, সাম্রাজ্য-বিজ্ঞানের একটি নাটকীয় অভিনয় মাত্র। অবশ্য দুই-চারিজন সত্যকার দরদী ভারতহিতৈষী বা মানব-

প্রেমিক যে তাঁহাদের মধ্যে নাই, সে কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহাদের সদিচ্ছা (pious wish) আমাদিগকে মিথ্যা আশায় বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু করিতে সক্ষম নয়। *

সোশ্যাল ডিমক্র্যাটদের সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইঁহাদের ইন্‌এভিটেবিলিটি অব গ্র্যাজুয়ালনেস অথবা এভোলিউশন থিওরি স্বদেশের পক্ষে কোনপ্রকারে সহনীয় মনে করা গেলেও, এবং ধনতন্ত্রের কৃপাপুষ্ট পৃথিবীর একদল প্রবীণ পণ্ডিতের বেশ পছন্দসই হইলেও, পরাধীন বিদেশীর পক্ষে ইহা সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের মত সমান মারাত্মক এবং যুদ্ধের প্রতিষেধক না হইয়া যুদ্ধের আমন্ত্রক। সেইজন্যই সাম্রাজ্যবিহীন নরওয়ে, সুইডেন, ডেন্‌মার্ক, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সোশ্যাল ডিমক্র্যাট দলের প্রভাব অনেকটা কলঙ্কমুক্ত, এমন কি প্রগতিশীল—ধনতন্ত্রের উপর ইহাদের ভিত্তি হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু ইহারা ক্ষুদ্র ও তুর্বল বলিয়াই—বড়দের ভয়ে সাধু সাজিয়া ঘরে বসিয়া আছে কি না, তাহা অবশ্য বলা কঠিন। সমাজতন্ত্র গ্রহণ করাই হয়তো ইহাদের পক্ষে অধিকতর 'লজিক্যাল' বা সঙ্গত ছিল। এবং সম্ভবত তাহারা ইহা গ্রহণও করিত—যদি ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া ইহাদের পক্ষে রুশিয়ার মত স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী হওয়া অসম্ভব না হইত, কিংবা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও আমেরিকার আক্রোশে পড়িবার ভয় না থাকিত। এই যুদ্ধের পর ইহাদিগকে শীঘ্রই সম্ভবত সোভিয়েট রুশিয়া কিংবা অ্যাংলো-আমেরিকা, তুইয়ের এক দিকে ভিড়িতে হইবে। অথবা দলে ভিড়াইতে গেলে পাছে নিজেদের

* ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচন ইতিমধ্যে শেষ হইয়াছে। শ্রমিকদল বিপুল সংখ্যা-গরিমা সহ কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে। এইবার ইহাদের পুনঃ পরীক্ষার সময় উপস্থিত।

মধ্যে নূতন গোলমাল ও সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেইজন্য ইহাদিগকে নিজ পথে চলিতে দেওয়া যাইতেও পারে। ঐ সব দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে ; তাই ইহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের গতি এখন কোন দিকে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

য়ুরোপের সোশ্যাল ডিমক্র্যাট এবং ভারতের লিবারাল ও লেবার দল

য়ুরোপের এই সোশ্যাল ডিমক্র্যাটদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের দেশের মডারেট বা লিবারাল নেতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ইঁহারা অনেকটা একধর্মী—যদিও য়ুরোপের সোশ্যাল ডিমক্র্যাটদের অধিকাংশের জন্ম সমাজের নিম্নস্তরে, আমাদের ইঁহাদের জন্ম উচ্চবর্ণে। আমাদের ইঁহাদের সম্বল কেবলমাত্র আবেদন, নিবেদন ও আন্দোলন ; উঁহাদেরও তাই, কিন্তু উঁহাদের হাতে একটি শেষ অস্ত্র আছে—ধর্মঘট, যাহা ইঁহাদের নাই। আমাদের দেশের শ্রমিক-নেতাদের এই তুলনার মধ্যে টানিলাম না এইজন্য যে, বেচারারা এখন পর্যন্ত কোন্ পংক্তিতে বসিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই এবং সেইজন্যই ইঁহাদের জাতি ও বর্ণ নির্ণয় এখনও সম্ভবপর নয় ; অথবা ইঁহারা নানাজাতি ও নানাবর্ণ। ১৯৪২, আগষ্ট মাসের ভারত-বিপ্লবে ইঁহাদের অবদান সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই আমার উল্লিখিত উক্তির অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং ইঁহাদিগকে বর্তমান আলোচনা হইতে বাদ দিয়া আমাদের লিবারাল এবং য়ুরোপের সোশ্যাল ডিমক্র্যাটদের বিষয়েই আলোচনা

করা যাক। ইঁহাদের পার্থক্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; এখন ইঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় দেখা যাক্। ইঁহারা উভয় দলই বিপ্লবকে ভয় করেন, নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারে বিশ্বাস করেন। ইঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, ঝড়ের মত বিপ্লবও প্রকৃতিরই একটি নিয়ম; শোষণ ও পরাধীনতার গ্লানি ও উৎপীড়ন যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন এই বিপ্লবের আবির্ভাব, দেবতার আবির্ভাবের মতই, অনিবার্য। এই সব দল বিপ্লব হইতে সময়কালে শুধু যে দূরে সরিয়া দাঁড়ান তাহাই নয়, ব্যর্থ বিপ্লবের যাহা কিছু সুফল ইঁহারা দুই হাতে কুড়াইয়া লন ও নূতন শাসন-রঙ্গমঞ্চে উজির, নাজির, কাজি সাজিয়া—জাঁকাইয়া দেশ শাসন করিতে বসিয়া যান। অন্য দিকে বিপ্লবীদল জেলে দ্বীপান্তরে নানা অত্যাচারে উৎপীড়নে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, নয়তো ফাঁসিকাষ্ঠে বলি যান। ইঁহাদের বিবেক কিন্তু নব-নব উপাধি, পদবৃদ্ধি ও লুণ্ঠিত অর্থের ছড়াছড়ির মধ্যে একেবারে অসাড়ে ঘুমাইতে থাকে। গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লেই সম্ভবত ভারতের একমাত্র লিবারাল নেতা, যিনি inevitability of gradualness থিওরির প্রতি তাঁহার বিশ্বাসের মর্যাদা ত্যাগের কষ্টিপাথরে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন—শাসক-শোষকের সর্বপ্রকার উপাধি, অর্থ ও পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া। গান্ধী তাঁহারই শিষ্য, কিন্তু এখন আর লিবারাল নন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। গোখ্‌লে বাঁচিয়া থাকিলে আজ কি হইতেন, কে জানে! তবে একথা ঠিক, 'অনেষ্ট লিবারাল'কে হয় কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নয়তো বিপ্লবী হইতে হইবে, যদি তাঁহারা সত্যসত্যই দোজ-হু-হ্যাভ-নটদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে

চান, ইহাদের উপর সনাতনী শাসন ও শোষণ চিরতরে বন্ধ করিতে চান। এতদ্ভিন্ন যে স্থান তাহা আত্ম-সেবার স্থান, দেশসেবার নহে। য়ুরোপের সোশ্যাল ডিমক্র্যাটদের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। বিপ্লববিমুখ মনোবৃত্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই ইহাদিগকে প্রলোভনের সহজ পথে টানিয়া লয় এবং ইঁহারা আদর্শচ্যুত হইয়া শেষ পর্যন্ত শোষকশ্রেণীর পরম সহায় হইয়া দাঁড়ান।

ফ্যাসিজ্‌মের জন্ম-ইতিহাস

ফ্যাসিজ্‌মের জন্ম-ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যেমন ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও ব্লুমের দুর্বলতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যুদ্ধোত্তর অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও শ্রমিক-বিপ্লব সম্ভবপর হইতে পারিল না, তেমনই জার্মানিতেও ওয়েমার রিপাব্‌লিকের চ্যান্‌সেলার ব্রুনিঙ্‌-এর দোদুল্যমান অবস্থার দরুন অনুরূপ সম্ভাবনা ব্যর্থ হইয়া গেল।

"Chancellor Bruning of the Weimar Republic had two fatal plans at this moment (1931). One was to break up the estates of the Prussian aristocrats and give them to the peasants. The other was to demolish the Storm Trooper formations of the Nazis."

কিন্তু তাঁহার প্ল্যান আর কার্যে পরিণত করা হইল না। সঙ্কল্প স্থির করিতে করিতেই "Instead, the army and the Nazis broke Bruning." সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের আত্ম-রক্ষার ইহা অল্‌-আউট শেষ চেষ্টা। এইবার এই নূতন আবির্ভাবের ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করা যাক। গত যুদ্ধে ইটালি জার্মানি

ও অষ্ট্রিয়ার সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অ্যাংলো-ফ্রান্স পক্ষে যোগদান করে; কিন্তু জয়লাভের পর ভার্সাই-সন্ধির সময় যখন লুটের ভাগ হয়, তখন তাহার ভাগে পড়ে অষ্টরম্ভা; ইংলণ্ড ও ফ্রান্সই প্রায় সব গ্রাস করে, আমেরিকা গোসা করিয়া সরিয়া দাঁড়ায়, তাহার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সন অ্যাংলো-ফ্রান্সের নিকট বোকা বনিয়া মনোত্বঃখে কিছুদিনের মধ্যেই দেহরক্ষা করেন। অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা-দান সত্ত্বেও তাহার প্রতি এরূপ আচরণ ইটালি ভুলিতে পারে না। তাই যদিও যুদ্ধের পূর্বে মুসোলিনী কম্যুনিষ্ট-কর্মী হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তথাপি যুদ্ধের পর কিন্তু তিনি তাঁহার মত ও পথ তুই-ই পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন এবং ধনিক ও শ্রমিক-স্বার্থসমন্বয়ের এক নূতন ফরম্যুলা আবিষ্কার করিয়া—তাহার দোহাই দিয়া ফ্যাসিজ্‌ম নামে এক নূতন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইলেন। কামারপুত্রের এই কৃতিত্ব জগতে এক বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। রুশ-বিপ্লবের ভয়ঙ্কর অন্তর্দ্বন্দ্ব, রক্তপাত ও শক্তিক্ষয় এবং অ্যাংলো-ফ্রান্সের প্রতারণা—এই তুই অবস্থাই সম্ভবত মুসোলিনীকে উহাদের প্রতি বিমুখ করিয়া তোলে এবং যুগপৎ কম্যুনিজ্‌ম ও অ্যাংলো-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাঁহাকে উত্তেজিত ও উদ্বোধিত করে। তাহার জন্য চাই অসীম শক্তি, সকল শ্রেণীর মধ্যে একান্ত ঐক্যবোধ ও প্রশ্নবিহীন আনুগত্য, চাই ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও দলপতির একনায়কত্ব। মুসোলিনী বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী—এই তুই বিপরীত পন্থীকে যাত্নমন্ত্রে এক করিয়া ঐ পথেই চলিলেন। মুসোলিনীর এই নূতন তন্ত্র হিটলার আগ্রহের সহিত লুফিয়া লইলেন।

কারণ যুদ্ধোত্তর জার্মানির অবস্থা তখন অত্যন্ত শোকাবহ। ঠিক এইবারকার মতই বিশ্ববিজয়ী বীরের ক্ষাত্রশক্তি লইয়া যুদ্ধ জিতিতে জিতিতেও সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মত শেষ অঙ্কে তাহার হার হইয়া গেল। বিন্দুমাত্র অনুকম্পা বিজয়ীরা তাহার প্রতি প্রদর্শন করিল না। লয়েড জর্জ ও ক্লিমেন্‌সো তাহার উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লইলেন, য়ুরোপে তাহার অঙ্গচ্ছেদ করিলেন, তারপর কপর্দকহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করিয়া পর্বতপ্রমাণ সমর-ঋণ ও ক্ষতিপূরণের বোঝা তাহার উপর চাপাইয়া দিয়া তবে তাহাকে ছাড়িলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া জীবিত জাতির পক্ষে যাহা হওয়া স্বাভাবিক, তাহাই হইল—শত্রুর প্রতি বিজাতীয় আক্রোশ ও ভয়ঙ্কর বিজিগীষা। তাহারই পরিণাম ফ্যাসিজ্‌ম ও পৃথিবীর এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নিজের ধর্ম (সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র) বজায় রাখিব, পরধর্ম অর্থাৎ সোভিয়েট ধর্ম গ্রহণ করিব না, কিন্তু বড়দা ও মেজদা—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে জব্দ করিব, ইহাই হইল নাৎসী জার্মানির প্রতিজ্ঞা। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে বিধর্মী সোভিয়েট রুশিয়াকে পূর্ব-সীমান্তে তাহার বিরাট দেহখানা লইয়া এইরূপ শক্তিমান হইয়া কিছুতেই থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে না। অথচ দুনিয়ার আকাশে বাতাসে কম্যুনিজ্‌মের বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ মানুষের মন তাহা দ্বারা আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ত। সুতরাং সহজে কার্যোদ্ধার করিতে হইলে, এই সম্মোহনমন্ত্রের সাহায্যেই দেশের শ্রমিক-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের মত; অন্য দিকে জাতীয়তাবোধের তীব্র অহমিকাকে প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে হৃত রাজ্য ও গৌরব উদ্ধারের নামে, প্রতিহিংসার হুতাশনে।

তাই জার্মানিতে এই ফ্যাসিজ্‌মের নামকরণ হইল ন্যাশনাল সোশ্যালিজ্‌ম। এক ঢিলে তুই পাখী মরিল—যুগপৎ জাতীয়তা-বোধের ও সমাজতন্ত্রের গোড়ায় নাম-মাহাত্ম্যের ইন্ধন যোগানো হইল। সাধারণ লোকে ভাবিল, আমার জার্মান জাতিও বাঁচিবে [অবশ্য অপরকে মারিয়া], সমাজতন্ত্রও মিলিবে। কিন্তু আগামী যুদ্ধে বিগত পরাজয়ের ক্ষতি ও কলঙ্ক মুছিয়া ফেলা তো একার সাধ্য নহে, তাহার জন্য চাই গুটিকয়েক মন্ত্রশিষ্য। স্পেনের ফ্রাঙ্কো হিট্‌লার-মুসোলিনীর সেই আশা পূর্ণ করিলেন। যুদ্ধোত্তর স্পেনে রাজতন্ত্রের অবসান হইয়া যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারই বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত ফ্রাঙ্কো শুরু করিলেন এক ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত অভিযান। এই শক্তিক্ষয়কর গৃহযুদ্ধ চলিল চারি বৎসর কাল—১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মুসোলিনী ও হিটলার সর্বপ্রকারে ফ্র্যাঙ্কোকে সাহায্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ইংলণ্ড ও ফ্রান্স য়ুরোপের এই নূতন গণতন্ত্রটি রক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া দর্শকরূপে তামাসা দেখিতে লাগিলেন। পরিণামে ফ্যাসিষ্ট-শক্তিরই জয় হইল। নিজেদের তুর্বলতা, নয়তো একটা স্থির আদর্শ ও সিদ্ধান্তের অভাব ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই আচরণের জন্য দায়ী, ইহা ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিবারও উপায় নাই। কারণ সেই সময়ে চার্চিল মুসোলিনী ও হিটলারের প্রশংসা এবং ষ্টালিনের নিন্দায় যেরূপ মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অ্যাবিসিনিয়ার উপর ইটালির এবং পর পর মাঞ্চুরিয়া ও চীনের উপর জাপানের অকারণ আক্রমণকে তৎকালীন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট পরোক্ষভাবে যেরূপ সমর্থন করিয়াছিলেন, এমন কি জাপান বর্তমান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার কিছুদিন পূর্বেও স্বয়ং

চার্চিল যেভাবে বর্মা রোড বন্ধ করিয়া দিয়া চীনের আত্মরক্ষার শেষ রাস্তা অবরোধ করিয়া জাপানকে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহাদের এরূপ আচরণের পিছনে যে রাজনৈতিক গূঢ় অভিসন্ধি কাজ করিতেছিল, তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহার একটি হইতেছে, অন্যান্য শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে অপরের রাজ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে দেওয়া, যাহাতে নিজের বিশাল সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হইতে পারে; আর একটি হইতেছে, সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে এই সব একনায়কাধীন শক্তিশালী জাতিকে আত্মরক্ষার বর্ম-স্বরূপ ব্যবহার করা। আশ্চর্য এই, ইঁহারাই আবার ফ্যাসিষ্ট বদনাম দিয়া ভারতীয় কংগ্রেসের কুৎসা রটনা করিয়া থাকেন! শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্প্রতি আমেরিকার এক সভায় পৃথিবীর এই সব পররাজ্য-লোলুপ অর্থগৃধ্নু অভিভাবকগণের স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য :—

"In 1931, the Indian National Congress was the only organised party in the whole world which protested against the Japanese occupation of Manchuria, but the British Secretary of State for Colonies said ; 'If we condemn Japan now, our policy in Egypt and in India stands condemned.'

India organised a Japanese boycott against British opposition, raised a lone voice on behalf of Abyssinia, sent a ship of grain from her own famine-starved land to Spanish republicans, while England and America were flirting with Franco. India was anti-Axis at a time when England was still helping Japan to fight by sending her metal, rubber and supplies. When the war came, India was eager and anxious to help towards a better world and the success of democracy and freedom."

কিন্তু সেই সুযোগ তাহাকে দেওয়া হইল না। উপরন্তু মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতির মত সত্যকার ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী, সত্যাশ্রয়ী, সর্বজনবরেণ্য নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে অবরুদ্ধ করা হইল; এবং তাহারই অর্থে তাহারই নিরুপায় লোকগুলিকে ভাড়া করিয়া তাহাদেরই পায়ের শৃঙ্খল দৃঢ় ও অপরের স্বাধীনতা হরণের ব্যবস্থা হইল। যুদ্ধজয় যতই নিশ্চিত ও নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, ততই গণতন্ত্র ও পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিয়া দিবার পুণ্যকথা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। এখন একমাত্র শ্লোগান দাঁড়াইয়াছে, স্থায়ী শান্তি চাই—যেন শান্তির মধ্যেই পরাধীন জাতির মুক্তি ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশিয়া আছে! কিন্তু এই স্থায়ী শান্তির অর্থ যে, পৃথিবীর অভিভাবকগণের মধ্যে যুদ্ধ না বাধাইয়া এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন জাতিগুলিকে শাসন ও শোষণ করিবার পাকাপাকি আপস ব্যবস্থা তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি আজ আমাদের হইয়াছে।

ভুরি-ভোজনে পেট মোটা করিয়া যাহারা বসিয়া আছে, শান্তি তাহাদের কাম্য হইলেও, বঞ্চিতের দল সেই শান্তি কখনও কামনা করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা যেন ভুলেও হৃদয়ে এই দুরাশা পোষণ না করে যে, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত কোন দেশ বা জাতি তাহাদের দেওয়া এই "স্থায়ী শান্তি" মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে এবং তাহাদিগকে দীর্ঘকাল সুখে স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে জমিদারির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দিবে। প্রথম সুযোগেই ইহারা এই শান্তিকে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়া বাহির হইবে মুক্তিপথের সন্ধানে—পেট-মোটাদেরই ভিতরকার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, তাহাদেরই একজনের গোপন পরামর্শে ও

সহযোগিতায়। জার্মানি ও জাপান তাহাদের পরাজয়ের ভরা পসরা মাথায় লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না; চীনও আমেরিকার অধীনে উঞ্ছবৃত্তি ত্যাগ করিবার জন্য সত্বরই মাথা ঝাড়া দিবে—সর্বোপরি ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ব-শান্তির বাসস্থান হইবে বারুদের ম্যাগাজিন-গৃহে। রুশিয়া ও অ্যাংলো-আমেরিকার সম্বন্ধের কথা না হয় নাই তুলিলাম।

ফ্যাসিজ্‌মের অর্থনৈতিক বনিয়াদ

এইবার ফ্যাসিজ্‌মের অর্থ নৈতিক বনিয়াদটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। কারণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্বের তুলনামূলক বিচারই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সম্পর্কে মুশকিল হইয়াছে এই যে, ফ্যাসিজ্‌ম সোভিয়েটিজ্‌মেরই রকমফের রূপ, না ধনতন্ত্রের ডি-লুক্স সংস্করণ, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যেই মতদ্বৈধ দেখা যায়।

ফ্যাসিজ্‌ম সমাজতন্ত্রের 'সোর্ন এনিমি'—ইহা যেমন এক পক্ষের ধারণা, অন্য দিকে বিলাতের ধনতান্ত্রিক-দলের বিখ্যাত অর্থনৈতিক মুখপত্র "Economist" ইহাকে ধনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়াই মনে করেন। ইহার মতে—

"Almost the only freedom left to the German employer is to put his name on the firm's stationery."

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম, উভয়ের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বলিলেও হয়। কিন্তু ফ্যাসিজ্‌ম এমনই চিজ যে, এক মূর্তিতে তাহাকে মনে হয় সোভিয়েটের দোসর, অপর মূর্তিতে সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের একরোখা গোঁয়ার কনিষ্ঠ সহোদর। শেষ

পর্যন্ত কিন্তু ইহার মিতালী হইল না উভয়ের কাহারও সঙ্গেই এবং দুই সীমান্তে দুই বিপরীতধর্মীর সঙ্গে একাই লড়িতে হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই যে ফ্যাসিজ্‌ম্‌-বাহিনী ধনিক ও শ্রমিক দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধেই দুই সীমান্তে লড়িয়া গেল, তাহা কাহার স্বার্থে ও কাহার সাহায্যে করিল ?

মার্ক্‌সীয় থিওরি অনুসারে যদি পৃথিবীতে ধনিক ও শ্রমিক এই দুইটি মাত্র শ্রেণী মানিয়া লইতে হয়, এবং তাহাদের স্বার্থ-বিরোধই দুনিয়ার সকল প্রকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবের মূল কারণ হয়, তবে ফ্যাসিজ্‌মের ব্যাখ্যা করা হইবে কি প্রকারে ? এই প্রশ্নের জবাব সে দিয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে, আমি শ্রমিকেরও নই, মালিকেরও নই :—

"It is a conception which leans neither to the Right nor to the Left," ইহা তবে কি এবং কার ?—"It is the co-ordinated development of all national resources for the common good,"..."a high conception of citizen-ship,"..."conception of the state as an absolute in comparison with which all individuals or groups are relative, only to be conceived of in their relation to the State. The Fascist State is itself conscious and has itself a will and a personality."—Hitler *Mein Kempf.*

ইহার ভাবার্থ—এই তত্ত্বে রাষ্ট্র চৈতন্যময়, ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান, স্বাধীন-সত্তা। ইহা বামপন্থী ও দক্ষিণ-পন্থীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া সর্বশ্রেণীর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করে, উচ্চাঙ্গের নাগরিক কর্তব্যজ্ঞানের উন্মেষসাধন করিয়া সকলের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের আগে দেখিতে শিক্ষা দেয়, সমাজের একটা সমগ্র একাত্ম ঐতিহাসিক রূপ উপস্থিত করিয়া সকলের যুক্ত মঙ্গলার্থ

যাবতীয় জাতীয় সম্পদের সুসমঞ্জস পুষ্টিসাধন করে। এক কথায়, ফ্যাসিষ্ট আদর্শে রাষ্ট্রকেই ভগবানের আসনে বসানো হইয়াছে। তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু রাষ্ট্র-ভগবান তো নিজ হাতে কার্য পরিচালনা করেন না, করিতে পারেন না, তাঁহার আমমোক্তার বা সেবায়েত তো একজন দরকার? তিনি কে? তাঁহাকে কে নির্বাচন করেন,—শ্রমিকদল, না, মালিকদল? কোন দলের ইহাকে সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয় না, ইনি স্বয়ংসৃষ্ট বা স্বয়ম্ভূ—নিজের অদ্ভুত প্রতিভা ও দক্ষতা বলে। বুঝিলাম, কিন্তু কাহার মঙ্গলার্থ ইনি কার্য করেন—শ্রমিক, না, ধনিকের?—শ্রমিক-ধনিকের তর্ক ভুলিয়া যান, ইনি স্বদেশ ও স্বজাতির সমষ্টিগত কল্যাণার্থ কাজ করিয়া থাকেন। প্র:—ইহা কি প্রকারে সম্ভব? সেই দেশে কি শ্রমিকশোষণ ও শ্রেণীবৈষম্য নাই? তাহাদের স্বার্থের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইবে? উঃ—মার্ক্‌স পড়িয়া ঐ এক বুলি শিখিয়া রাখিয়াছেন, বুর্জোয়া ও প্রলিটারিয়াটের চিরন্তন বিরোধ। ফ্যাসিজ্‌মে ঐ সব ভুয়া কথা অচল। প্র:—বেশ, তাহাই না হয় মানিয়া লইলাম, কিন্তু এইরূপ সমষ্টিগত মঙ্গলসাধনের উপায়টা কি ও ইহার শেষ কোথায়? উ:—উপায় হইতেছে পৃথিবীর অন্যান্য শিকারীর মুখ হইতে শিকারগুলিকে ছলে-বলে-কৌশলে কাড়িয়া লইবার জন্য বা নূতন শিকার ধরিবার জন্য দেশের ধনিক ও শ্রমিক উভয় দলকে পাচন-বাড়ি হাতে তাড়না করা; আর সর্বশেষে লড়াই করা। প্র:—কিন্তু বিরুদ্ধ স্বার্থ লইয়া ইহারা এক হইবে কেন? উ:—অনন্যোপায়ে,—শক্তিশালী কূটবুদ্ধি নেতার প্যাঁচে পড়িয়া, নয়তো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে; ভয়ে, নয়তো ভক্তিতে, প্রতিহিংসার জ্বালায়,

নয়তো ফিউচার প্রস্‌পেক্টের আশায়। প্রঃ—ফ্যাসিষ্টদের ইংরেজের ছোট ভাই বলিলেন কেন? উভয়ের অর্থনৈতিক গোত্র ত এক নয়, —কারণ ফ্যাসিষ্টরা তো মালিক ও শ্রমিক উভয়কে সমানভাবে তাড়না করে? উঃ—উভয়কে মিলাইবার জন্য ইহা একটি বাহ্যিক ভড়ং মাত্র। আসলে ধনিক ও শ্রমিক মার্ক্‌সীয় এই পুরাতন নাম ও বিভাগ তুলিয়া দিয়া ইহারা নায়ক (leader) ও অনুচর (follower)—এই নূতন নামে মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহাই সমাজ-বিজ্ঞানে ইহাদের নূতন দান; কিংবা পুরাতন অবদানের নূতন নাৎসী সংস্করণ। প্রঃ—বুঝিলাম, কিন্তু ধনতন্ত্রে ক্যাপিটালিষ্ট ও লেবারারের যে সম্বন্ধ, তাহাও তো লিডার ও ফলোয়ারেরই সম্বন্ধ? তাহা হইলে তফাতটা কোথায়? উঃ—তফাত খানিকটা আছে বই কি, তলাইয়া দেখিলে। সত্য বটে, ধনী যে, (শ্রমিকের) নেতাও সে; কিন্তু ধনিক-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বণিকবৃত্তিতে কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রবেশ করিতে হয়। আর ফ্যাসিষ্টতন্ত্রে যাহার মধ্যে পুরুষকার বা নেতৃত্বের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই বাছিয়া লওয়া হয়—এক-একটি দিক্‌পাল তৈয়ারি করিবার জন্য। উহাদের ধনতন্ত্রে বৈশ্যের প্রাধান্য, ক্ষত্রিয় তার ভাড়া-করা গুণ্ডা; আর ইহাদের ধনতন্ত্রে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য, বৈশ্য তার অনুগত সহচর। শূদ্র উভয় ক্ষেত্রেই শূদ্র। প্রঃ—সোভিয়েট রুশিয়ায় কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, এবং কে শূদ্র জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? উঃ—নিশ্চয়ই, সোভিয়েট রুশিয়ার বৈশিষ্ট্য এই, সেখানে বৈশ্যকুল নির্মূল হইয়াছে। সেখানে রাষ্ট্রই স্বয়ং ভগবান নহেন, সেখানকার রাষ্ট্র-বিগ্রহ হইতেছে শূদ্র; আর তাঁহার সেবায়েত হইয়াছেন শূদ্রবংশোদ্ভূত নূতন একদল

ক্ষত্রিয়। শূদ্র-দেবতার নামে ভোগ দেওয়া হয়, প্রসাদ ক্ষত্রিয় শূদ্র সকলেই পান, তবে সমান নহে, তাহার মধ্যে বড় হিস্যা, ছোট হিস্যা আছে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি; সকল তন্ত্রেই ব্রাহ্মণ আছেন; উঁহারা যে তন্ত্রের যিনি সেবায়েত, তাঁহারই গুণকীর্তন এবং তাঁহারই আদেশমত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করিয়া প্রসাদ পান।

অর্থনৈতিক পঞ্চমকারের মধ্যে চারি মকারের (ক্যাপিটালিজ্‌ম, ডিমক্র্যাটিক সোশ্যালিজ্‌ম বা ট্রেড-ইউনিয়নিজ্‌ম, মার্ক্‌সীয় সোশ্যালিজ্‌ম ও ফ্যাসিজ্‌ম-এর) স্বরূপ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম। এবার গান্ধীয়ান সোশ্যালিজ্‌ম বা কংগ্রেসের অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চারি মকারের পটভূমিকায় দুর্বোধ্য গান্ধীবাদ বুঝিবার পক্ষে এখন অনেকটা সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করি। কারণ চারি মকারের চক্ষু-ধাঁধানো রূপই আমাদিগকে মোহান্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই মোহ কাটিলে সহজ ও সরল জিনিসও যে সত্য ও সুন্দর হইতে পারে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো কঠিন হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারি মকারের সারতত্ত্ব

ইতিপূর্বে ক্যাপিটালিজ্‌ম, মার্ক্‌সীয় কম্যুনিজ্‌ম, ডিমক্র্যাটিক সোশ্যালিজ্‌ম এবং ফ্যাসিজ্‌ম-এর স্বরূপ আলোচনা করিয়া ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহাদের কোনটাই তুনিয়ার কৃষক-শ্রমিক বা তুর্গত-বঞ্চিতদের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্যক্তিগত মুনাফা বা লাভের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। সস্তায় কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া চড়া দরে পাকা মাল বিক্রয়ের জন্য তাহার চাই কতকগুলি অধীন দেশ; মূলধন-বিনিয়োগ ও নূতন নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য, নামমাত্র মজুরি দিয়া অগণিত কুলীর জন্য চাই আফ্রিকা ও এশিয়ার দাস জাতি। আবার এই সব দাসজাতি ও পরাধীন দেশকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চাই চারিদিকে নৌ ও বিমান-ঘাঁটি; সুতরাং তাহার জন্যও চাই আরও তাঁবেদার দেশ। এইভাবে বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে চলিয়াছে অন্তহীন লোভ ও স্বার্থ-সংঘর্ষ, আর তাহার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়াইতেছে লড়াই। এই লড়াই আরও অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে এই কারণে যে, ধনতন্ত্র মানুষের মধ্যে যেমন তুই শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনই তাহার সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়া জাতির মধ্যেও তুই জাতের সৃষ্টি করিয়াছে—দোজ-হ্‌-হ্যাভ এবং দোজ-হু-হ্যাভ-নট। শেষোক্তদের মধ্যে আবার স্বাধীন ও পরাধীন

দুই শ্রেণী রহিয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন জাতিগুলিকে জাঁতিকলে ফেলিয়া চাপিয়া রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও, য়ুরোপের স্বাধীন স্বজাতিদিগকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া সব গ্রাস করিতে গেলে তাহার ফল কিরূপ হয়, ফ্যাসিজ্‌মের অভ্যুদয় এবং একারকার মহাযুদ্ধই তাহার উপযুক্ত জবাব। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র গণতন্ত্রের আড়াল দিয়া বকধার্ম্মিক সাজিয়া যীশুর নাম জপিতে জপিতে দুনিয়ার কালো ও পীত মনুষ্যদের মানুষ করিবার দুঃসহ ভার (white men's burden) বহন করিয়া বেড়ায়; আর সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিষ্টতন্ত্র তাহাই সাধন করিতে উদ্যত হয়, ছলচাতুরীর মিথ্যা মুখোশ পরিয়া নয়, পরিষ্কার ভাষায় নিজ জাতির বর্তমান দুর্গতি ও গৌরবময় সম্ভাবনার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা, ধনী-নির্ধন সকলকে বিশ্ববিজয়ের মহা সমরাভিযানে আহ্বান করিয়া। শান্তির মধ্যে সুখভোগ করিবার উপায় ইহার নাই, কারণ সে বঞ্চিতদের দলে। শান্তিভঙ্গ করিয়া বিত্তশালীদের পররাজ্য কাড়িয়া লইতে পারিলে তবেই সেও শান্তিমন্ত্র জপিতে শুরু করিবে—তাহার পূর্বে নয়। এমনই চলিবে অনিবার্য লড়াইয়ের আবর্ত ও শান্তির ভাঁওতা। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি—তাহাও বেশি দিন চলার আগেই মনুষ্যকুল নির্মূল হইবে, যদি না উহারা উহাদের মেজাজ ও মর্জি আমূল পরিবর্তন করে। হিটলার-গোয়েবেল্‌সের চিতাগ্নি নিবিতে না নিবিতে পরাজিত, বিধ্বস্ত জার্মানির দুর্দিনের নূতন ও শেষ পররাষ্ট্রসচিব ভন্ ক্রোসিক যে কথা বলিয়াছেন (রয়টারের ১৯৪৫।২রা মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ), তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি :—

"In San Fransisco they are deliberating on the organisation of a new world order which is to give mankind security against new war. The world knows very well that the third world war will not bring about the fall of a nation but the end of humanity. *The terrible weapons which there has been no time to apply in this war, would take full effect in the third world war and sow death and destruction amid humanity.*"

আর ছয় মাস সময় জার্মানি লাভ করিতে পারিলে এইবারই সেই তাণ্ডব হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইত।

যে কথা বলিতেছিলাম—ক্যাপিটালিজ্‌ম ও ফ্যাসিজ্‌ম উভয়েরই ধর্ম অপরকে শাসন ও শোষণ করিয়া নিজে বড় হওয়া। একটির মধ্যে কূটচক্রী, ধূর্ত বৈশ্যের প্রাধান্য; অপরটির মধ্যে একরোখা গোঁয়ার বীর্যশালী ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য। একটি অপহৃত পরস্ব রক্ষা করিতে ব্যস্ত; অপরটি তাহাতে ভাগ বসাইতে ব্যগ্র। একটি মারেন তিলে তিলে দগ্ধাইয়া, মানুষকে অমানুষ করিয়া; অপরটি সংক্ষেপে কার্য শেষ করিয়া। উভয়েই নিষ্ঠুর, বিকৃত ও কলুষিত মনুষ্যত্বের এপিঠ ওপিঠ। তাই দাদার হাতে মার খাইয়া মরণকালেও দাদার ধর্ম হিটলার পরিত্যাগ করেন নাই এবং দাদাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া তাহার হাতেই সব কিছু, মায় সম্ভবত গুপ্ত-অস্ত্র ও গুপ্ত-মন্ত্র, দিয়া গিয়াছেন—সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য।

এই তো গেল ক্যাপিটালিজ্‌ম ও ফ্যাসিজ্‌ম-এর রূপ। এইবার ডিমক্র্যাটিক সোশ্যালিজ্‌ম সম্পর্কে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহার সারতত্ত্ব দিতে হইলে বলিতে হয়, ইহা নপুংসকের

ধর্ম ; ধনতন্ত্র বজায় রাখিয়া বিধিসঙ্গত উপায়ে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রফাসূত্রে শ্রমিকদের অবস্থার ক্রমোন্নতি-সাধনই ইহাদের লক্ষ্য। শ্রমিক-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত হইলেও, সেই সুযোগ গ্রহণ করিবার মত সাহস ও বিপ্লবী মনোবৃত্তি ইহাদের নাই। ইহারা শ্রমিককে শ্রমিকই রাখিতে চায়—তবে তাহাদের মজুরি, বাসস্থান, কার্যকাল (working hours), বেকার ও বার্ধক্য ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে অবস্থার খানিকটা সংস্কার ও উন্নতি কামনা করে। তাহার জন্য ইহাদের সম্বল হইল ট্রেড ইউনিয়ন ও শেষ অস্ত্র ধর্মঘট। এই উপায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, লড়াইয়ের আধুনিক সর্বগ্রাসী রূপ প্রকাশ পাইবার পূর্বে, শ্রমিকদের অবস্থার খানিকটা উন্নতি য়ুরোপে সংসাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অধুনা ধনতন্ত্রের মূল ব্যাধি ও অন্তর্বিরোধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায়, গুটিকয়েক ধনীর স্বার্থরক্ষার জন্য দেশের ও জাতির নামে লড়াইয়ের নরমেধযজ্ঞে ইহাদের আত্মাহুতির পথ ভয়ঙ্কর রকম প্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে। লড়াইয়ের এই ঘূর্ণ্যাবর্ত হইতে শ্রমিক ও কৃষককুলকে বাঁচাইতে হইলে সামান্য রিফরম্‌স বা সংস্কারের আর কর্ম নহে—প্রয়োজন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার মত সাহস ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধি ইহাদের নাই। তথাপি ইতিহাসে ইহাদের একটা ভূমিকা আছে ; সেইটি হইতেছে শূন্যতা পূরণ করিবার ভূমিকা ; যুধ্যমান পক্ষদের মধ্যে যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে তাহার ফল কুড়াইবার ভূমিকা। ইহাদের Mr. Facing-both-ways নামও দেওয়া যাইতে পারে কিংবা কনের ঘরের পিসী, বরের ঘরের মাসী। ইংলণ্ডের লেবার

পার্টি, এদেশের লিবারাল দল, এমন কি লেবার ইউনিয়নেরও অধিকাংশই এই শ্রেণীর। বিশ্বের সামাজিক বিপ্লব যদি আসন্ন হইয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ইহাদের অবদান হইবে রক্ষণশীল দলের পক্ষে, যেমন পূর্বাপর হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সোভিয়েট রুশিয়ার উভয়-সঙ্কট—
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি

যে চারিটি মকারের আলোচনা করিয়াছি, তন্মধ্যে একমাত্র মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রই কৃষক-শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে রুশিয়ায় এক বিপ্লবের মধ্য দিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও এক দিকে সার্থক হইয়া অন্য দিকে ব্যর্থ হইবার পথে চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেখানে কৃষক-শ্রমিকদের অর্থ-নৈতিক সমসুযোগ ও নিরাপত্তা (equal economic opportunity and security) অনেকটা লাভ হইয়াছে সত্য; কিন্তু একনায়কাধীন নূতন দলের নিরঙ্কুশ শক্তির চাপে তাহাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। এবং সোভিয়েট রুশিয়াকে আন্তর্জাতিক আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া এক ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অ্যাংলো-আমেরিকার সহিত যোগদান করিতে এবং পৃথিবীর ভাগাভাগিতে তাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইতে হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এত করিয়াও মিত্রদের প্রতিকূলতা হইতে আত্মরক্ষার সমস্যা তাহার এখনও মিটিল না। বরং সেই সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ

পরস্পরের প্রতি ইহাদের আন্তরিক অবিশ্বাস ও অস্ত্র-শস্ত্রের উপর পূর্ণ-বিশ্বাস। তাহারই স্বাভাবিক পরিণাম—উগ্র জাতীয়তাবাদ ও তদানুষঙ্গিক সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রমার্কা হইলেও যুদ্ধবিগ্রহকে ডাকিয়া আনিবেই। তখন যাহা ঘটিবে তাহা শুধু এই যে, সাবেক ধনীদের নির্মূল করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার মত নূতন এক দল লোক ওই সব দেশের রাষ্ট্র অধিকার করিবে এবং সোভিয়েটের অনুকরণে বা আওতায় কৃষক-শ্রমিকের উপর অসীম প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া (অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের খাওয়া-পরা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া) পৃথিবীর অপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরুদ্ধে লড়িতে থাকিবে। এমনও হইতে পারে, এই সব প্রতিপক্ষও ইহাদেরই মত সমাজতান্ত্রিক দেশ! এখন কথা হইতেছে, প্রাণ রাখিতেই যদি প্রাণান্ত হইতে হয়, তবে কৃষক-শ্রমিক রাজের আর মূল্য কি থাকিবে? এবং প্রত্যেক জাতির সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া বিশ্বজনীন সহযোগিতার ভিতর দিয়া রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিয়া সকল দেশে শ্রেণী-বিহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে কথা ছিল, তাহারই বা কি হইবে?

অবশ্য এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে অ্যাংলো-আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিতেই হইবে এবং এখন পর্যন্ত তাহার প্রধান ও একমাত্র প্রতিপক্ষ সোভিয়েট রুশিয়া, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, আত্মরক্ষার তাগিদে সে যে পথে চলিতে শুরু করিয়াছে, সেই পথ ক্রমেই তাহাকে বিপদ হইতে বিপদান্তরে টানিয়া লইয়া যাইবে এবং দুনিয়ার একমাত্র সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত তাহার স্বধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে

না। আশঙ্কার কারণ বলিতেছি। তাহার নিজ আচরণের দরুন কিংবা যে কারণেই হউক, পৃথিবীর কৃষক-শ্রমিকদের পূর্ব সহানুভূতি ও আস্থা সে যেন রক্ষা করিতে পারিতেছে না। অন্যথা ফ্রিস্কো সম্মেলনে পোল্যাণ্ড ও আর্জ্জেন্‌টাইন প্রশ্ন সম্পর্কে ৩১ : ৩ ভোটে অ্যাংলো-আমেরিকার নিকট তাহার এ ভাবে পরাজয়ের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া ভিন্ন ২৯টি দেশ অ্যাংলো-আমেরিকার পক্ষে ও তাহার বিপক্ষে ভোট দিয়াছে। এই ভোট দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ২৯টি দেশের প্রতিনিধি অ্যাংলো-আমেরিকার দলে এবং এই সব দেশের গভর্মেণ্টের উপর কৃষক-শ্রমিকদলের কিংবা সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব অপেক্ষা ধনিক-সম্প্রদায়ের ও অ্যাংলো-আমেরিকার প্রভাব এখন পর্যন্ত অধিকতর প্রবল। এই অবস্থায় রুশিয়া যদি অ্যাংলো-আমেরিকার নিকট তাহার এই কূটনৈতিক পরাজয় (diplomatic defeat)কে সহজভাবে গ্রহণ করিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনা কি আরও আসন্ন হইয়া আসিবে না? সেই যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে? আর যুদ্ধ যদি না-ই বাধে, তবে ইহাদের মধ্যে পৃথিবীতে কোন্ পক্ষের প্রাধান্য চলিবে? ফ্রিস্কো কন্‌ফারেন্স হইতে ফ্যাসিষ্ট-প্রথায় শাসিত চল্লিশ কোটি ভারতবাসী আমরা কি পাইয়াছি এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য পরাধীন জাতিগুলিই বা কি পাইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই কি এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না? প্রথম মহাযুদ্ধের পরই যে কম্যুনিষ্ট রেভোলিউশন লেনিন সারা য়ুরোপে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা সফল হয় নাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও কি তাহার তেমনই বিফল হইবার লক্ষণ সব দেখা

যাইতেছে না? অ্যাংলো-আমেরিকান ব্লক কি সোভিয়েটকে আত্মরক্ষার চাপে ফেলিয়া আস্তে আস্তে নিজেদেরই দলে ভিড়াইতে বাধ্য করিতেছে না? বিশ্ব পরিস্থিতি যদি এই হয়, তবে পরাধীন জাতিগুলির ও পৃথিবীর যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষকশ্রমিক দলের মুক্তি আসিবে কি উপায়ে, কোন্ পথে?

গান্ধীবাদ ও প্রতিযোগিতা বনাম সহযোগিতা

সেইজন্যই আজ মনে হইতেছে, আমাদের আধুনিক সংস্কার ও ভাবধারার প্রতিকূল হইলেও গান্ধীজ্‌মের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন মানব-জাতির যেন গত্যন্তর নাই। যুদ্ধকে বরবাদ করিতে না পারিলে পাশ্চাত্য জাতিগুলি নিজেরাও মরিবে এবং আর সকলকেও জোর করিয়া সহমরণে লইয়া যাইবে। মরিতে আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু বনের পশুর মত খাওয়া-খাওয়ি, কামড়া-কামড়ি করিয়া মরিবার জন্য অমৃতের সন্তান মনুষ্যজাতিকে ভগবান নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেন নাই। তবে এ ভাবে মরিব কেন?

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে, গান্ধী-নীতি অবলম্বন করিতে পারিলেই যুদ্ধকে কি একেবারে বাদ দেওয়া যাইবে? এই প্রশ্নের এই উত্তর যে, গান্ধী-নীতি অবলম্বন না করিলে যুদ্ধবিগ্রহ, দুঃখদৈন্য যেরূপ অবধারিত, উহা অবলম্বন করিতে পারিলে তাহার সম্ভাবনা অনেক কম। যদি গান্ধীবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে পৃথিবীর সভ্য ও শক্তি-শালী জাতিসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্তরের সহিত গ্রহণ করে, তাহা হইলে যুদ্ধকে হয়তো একেবারেই বাদ দেওয়া সম্ভবপর হইবে। তার পর, এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, পৃথিবীতে চূড়ান্ত

(absolute) বলিয়া কোন বস্তু নাই; অসামঞ্জস্য (antithesis) হইতে সামঞ্জস্যের (synthesis-এর) দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টাই বড় কথা এবং বিধাতার বিধান (Law of the Universe)। Norman Angell ঠিকই বলিয়াছেন, "The essence of truth is degree"। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে গান্ধীপথ যুদ্ধবিরোধী পথ এবং ঐ পথে আমরা যতই অগ্রসর হইতে পারিব, ততই যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণগুলি আপনা হইতে অপসারিত হইতে থাকিবে, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। গান্ধী-নীতি ও গান্ধীপথ বলিতেই সত্য ও অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগরূপ দুর্বোধ্য ও দুষ্পালনীয় দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়ে যুগপৎ উদয় হইয়া সিনেমাশিক্ষিত শহর-সভ্য আমাদিগকে অনেকটা ঘাবড়াইয়া দেয়। কিন্তু দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব মনে করিয়া যাহাকে জীবনে অকেজো বলিয়া আমরা বাদ দিয়া রাখিয়াছি, তাহা কিন্তু সত্যই ততটা দুরূহ নয়, যতটা আমরা বুঝিবার ও জানিবার কোন চেষ্টা না করিয়াই ভাবিয়া বসিয়া আছি। সত্য পালন মোটেই খুব কঠিন ব্যাপার নয়, চারিদিকের অবস্থা যদি তাহার প্রতিকূল না হয়। অহিংস হওয়াও খুব শক্ত কাজ নয়, প্রতিবেশীরা সকলে মিলিয়া যদি আমাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা না করে। অন্যায়ের সহিত নীরব অসহযোগ এবং প্রয়োজন হইলে তাহার বিরুদ্ধে শান্ত প্রতিরোধ কি লক্ষ লক্ষ লোকের সপরিবারে অনাহারে শহরের আঁস্তাকুড়ের পাশে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষাও বেশি কঠিন? কিংবা যুদ্ধে যাইয়া নয়তো গৃহে বসিয়া, সুপারফোর্ট ও সুপারট্যাঙ্কের বোমা ও গুলির বিস্ফোরণে দেহখানাকে আতশবাজীর মত উড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষাও অধিকতর দুরূহ? যাহা হউক, এই প্রশ্নের আলোচনা

বর্তমানে স্থগিত রাখিয়া আমি বস্তুতন্ত্রের দিক দিয়াই গান্ধীবাদের বিচার করিব; কারণ বাস্তব ব্যাপার লইয়াই অর্থনীতির কাঁরবার।

পূর্বগামী আলোচনায় আমরা ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, অবাধ প্রতিযোগিতা, বৃহদাকার যন্ত্র, অনিয়ন্ত্রিত বহু-উৎপাদন এবং ব্যক্তিগত মুনাফা বজায় রাখিতে হইলে, উগ্র দেশাত্ম-বোধ ও হিংস্র জাতীয়তাবাদের অনুশীলন ও প্রচার অবশ্যম্ভাবী এবং তৎদরুন পরিণামে সংঘর্ষ অবধারিত। গান্ধী-অর্থনীতির একেবারে গোড়ার কথা হইল, কর্মক্ষেত্রে আমাদের সর্বপ্রথম আদর্শ হইবে সহযোগিতা—প্রতিযোগিতা নয়। এইখানেই অর্থনীতির মোড় ঘুরাইয়া দিতে না পারিলে, পরে নানারকম সংস্কার ও সংশোধনে কোন ফল পাওয়া যাইবে না। মুখে সহযোগিতার কথা প্রচার করিয়া, কিংবা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্দয় প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলে মনকে চোখ ঠারা হইবে, কিন্তু আগুন লইয়া খেলার নিবৃত্তি হইবে না। এইরূপ আচরণ ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার পরস্পরবিরোধী আত্মঘাতী কার্য-কলাপের আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। যোগ্যতমের উদ্বর্তন কিংবা জীবনসংগ্রামের দোহাই দিয়া অনেকে এইরূপ প্রতিযোগিতাকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহা অন্যায় ও অযৌক্তিক। কারণ এইরূপ আইন পশুপক্ষী বনের কীট-পতঙ্গের বেলায় সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হইলেও ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিবেক ও বিচার সম্পন্ন মনুষ্যের ক্ষেত্রে কখনও প্রযোজ্য হইতে পারে না। এই বিষয়ে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের সহিত গান্ধীবাদের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এই সম্পর্কে Engelএর মত উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Darwin did not know what a bitter satire he wrote on mankind and specially on his own fellow countrymen when he proved that free competition, the struggle for existence, which the economists prize as the greatest historical achievement, is the normal state of the animal kingdom."

নৈসর্গিক জগতে পশুর আচরণই যেন মানব-বিবর্তনের শেষ কথা!

সুতরাং প্রথমেই পাশ্চাত্য অর্থনীতির যাহা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কীর্তি অর্থাৎ অবাধ প্রতিযোগিতা (free competition) তাহাই তাহাকে পরিহার করিতে হইবে। অবাধ প্রতিযোগিতা যে অচল তাহা উঁহারাও বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই নানা প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তি দ্বারা উহাকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ নিয়ন্ত্রণ সার্বজনীন কিংবা বিশ্বজনীন না হইয়া দলগত ও প্রতিপক্ষের প্রতিকূল হওয়ার দরুন ইহার ফল আরও অশুভ হইতেছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় দলাদলি ও প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এই আত্ম-কেন্দ্রিক লোভ হইতে সৃষ্ট গোলক-ধাঁধাঁর বাহিরে আসিতে হইলে সহযোগিতা-মন্ত্রকে বিশ্বমানবিক করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে একেবারে গোড়া হইতে অর্থাৎ সম্পদ-স্রষ্টা অথচ বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিকদের লইয়া কাজ শুরু করিতে হইবে। কিন্তু মুখের কথায় তো তাহা হইবার নয়। প্রতি-যোগিতার পুরাতন অভ্যাসকে সহযোগিতার অভ্যাসে রূপান্তরিত করিতে হইলে তাহার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

গান্ধীবাদ ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্প

তাহার জন্য প্রথমেই বৃহদাকার যন্ত্রদানবকে হয় বাদ দিতে, নয়তো কঠিন শাসনে রাখিতে হইবে। কারণ এই বৃহৎ যন্ত্রই মানুষের মধ্যে অন্তহীন লোভের বৈশ্বানর প্রজ্বলিত করিয়া তাহাকে এক নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় দৌড় করাইয়া মারিতেছে। ইহাই আজ লক্ষ লক্ষ লোককে হয় কর্মহীন বেকার, নয়তো প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে। ইহার অসীম ক্ষুধা মিটাইবার জন্যই আজ পুনঃ পুনঃ বিশ্ব-নরমেধ-যজ্ঞের প্রয়োজন হইতেছে। বহু-উৎপাদন ও যন্ত্র-দানবের মোহ কাটাইতে না পারার দরুনই সোভিয়েট রুশিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াও কৃষক-শ্রমিকের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। কারণ যন্ত্রদানবের বিরাট ও জটিল উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের কার্য নয়। তাই রাষ্ট্রীয় শক্তি সেখানে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও প্রসারিত না হইয়া এক নূতন শক্তিশালী দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সেইজন্যই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন-যন্ত্রটাকে প্রথম হইতে এতটা সরল ও সহজ করিয়া তৈয়ারি করিতে হইবে, যাহাতে উহা সর্বসাধারণের বোধগম্য ও আয়ত্তাধীন হইতে পারে।

শুধু তাহাই নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর বর্তমান সমস্যা সমভাবে ধনবণ্টনের (equal distribution of wealth-এর) সমস্যা ধন-উৎপাদনের (production of wealth-এর) সমস্যা নয় কিন্তু ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রদানবের অবাধ লীলা যতদিন চলিবে, ততদিন ইহা শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্যসম্পদের উদ্বৃত্ত মূল

(surplus value) ধনিকের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাকে করিতে থাকিবে অধিকতর ধনী আর শ্রমিককে অধিকতর দরিদ্র। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিবে এক দল আত্মাহীন যন্ত্রদাসের ও আর এক দল ভিক্ষাজীবী (অর্থাৎ dole-ভোগী) বেকারের সৃষ্টি। এইজন্যই গান্ধীজীর অর্থনীতিতে বৃহৎ যন্ত্রের স্থান সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। অনেকের ধারণা, তিনি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সুখ-সুবিধা মাত্রেরই সম্পূর্ণ বিরোধী এবং প্রাচীন সভ্যতা ও পন্থার প্রতি অন্ধ প্রীতিই ইহার কারণ। কিন্তু গান্ধীজীকে যাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা জানেন যে, গান্ধীজীর পক্ষে কোন সংস্কারের দাস হওয়া অসম্ভব, কারণ তিনি সত্যসন্ধানী। তাঁহার পক্ষে মননশীল ও বিচারশীল হওয়াই স্বাভাবিক, পরানুকরণ কিংবা পুরাণানুকরণ অস্বাভাবিক ; ভ্রান্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে বরং সম্ভব, কিন্তু অন্ধ হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বৃহৎ যন্ত্রের অবারিত ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার সত্যকার মতামত ও অভিপ্রায় তাঁহার নিজেরই অসংখ্য লেখার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। আমরা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে তাহারই গুটিকয়েক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"I have no design upon machinery as such. I would prize every invention made for the benefit of ALL. I would welcome the machine that lightens the burden of crores of men living in cottages."

* * *

"Mechanisation is good when the hands are too few for the work intended to be accomplished. It is an evil when there are more hands than required for the work, as is the case in India."

* * *

"The problem with us is not how to find leisure for the teeming millions inhabiting our villages. The problem is how to utilise their idle hours which are equal to the working days of six months in the year."

* * *

"*Today, machinery merely helps a few to ride on the backs of millions. The impetus behind it all is not the philanthropy to save labour, but greed.* It is against this constitution of things that I am fighting with all my might."

সোশ্যালিষ্টিক-প্রথায় বৃহৎ যন্ত্র-সাহায্যে বহু-উৎপাদন চলিলে বেকার-সমস্যা দেখা দিতে না পারে, কিন্তু তাহাতেও কল-কারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কুফল থাকিয়াই যাইবে। তাই পণ্ডিত নেহেরুকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী বলিতেছেন ঃ—

"Pandit Nehru wants industrialisation because he thinks that, if it is socialised, it would be free from the evils of capitalism. My own view is that the evils are inherent in industrialism and no amount of socialisation can eradicate them."

মহাত্মার এই মত প্রাচীন ও নবীন বহু মনীষী কর্তৃক সমর্থিত। রিকার্ডো, অ্যাডাম স্মিথ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজতন্ত্রের আদিগুরু কার্ল মার্ক্স পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ—

"A man whose whole life is spent in performing a few simple operations, becomes as stupid and ignorant as it is possible for a human creature to become."—(Adam Smith's *Wealth of Nations*)
"The substitution of machinery for human labour is very injurious to the interests of the class of labourers."—(Ricardo's

Principles of Political Economy). "Owing to the extensive use of machinery and division of labour, the work of the proletariats has lost all individual character. * * he becomes an appendage of the machine."—(Karl Marx's *Communist Manifesto*). "The modern manufacturing process transforms the worker into a cripple and a monster."—(Karl Marx's *The Capital*)*

শুধু তাহাই নয়। এইরূপ বৃহৎ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে রুশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় নাই, তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, গান্ধীজীর যন্ত্রবিমুখতা তাঁহার প্রাচীন কুসংস্কার-প্রীতিপ্রসূত নহে, পরন্তু পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারবুদ্ধিসঙ্গত এবং বিশ্বের দরিদ্রদোহন ও উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিবার প্রবল বাসনাপ্রসূত।

একটি ভ্রান্ত ধারণা

এখানে আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করা প্রয়োজন। আমরা আজও মনে করি, এদেশে সত্বর কতকগুলি বৃহৎ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমাদের বেকার সমস্যা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য প্রভৃতি গুরুতর সমস্যাগুলি মিটিয়া যাইবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইহা দ্বারা শহরে মধ্যবিত্ত 'ভদ্র'-শ্রেণীর বেকার সমস্যার সাময়িক সমাধান খানিকটা হইবে বটে; কিন্তু ভারতের সাত লক্ষ পল্লী-অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীর—কৃষক

* এই সম্পর্কে Aldous Huxley, Eric Gill, D. H. Lawrence, H. J. Massingham, এবং W. Wellock প্রভৃতি আধুনিক চিন্তানায়কগণের অভিমতও গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অনুকূল।

ও কারিকরের সমস্যা আরও বহুগুণ বর্ধিত হইবে। কারণ যন্ত্র তাহাদের যতগুলিকে গ্রহণ করিবে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে বৃত্তিহীন করিয়া পথে বসাইবে। বৃহৎ উৎপাদনের শ্রীক্ষেত্র হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। এই ক্ষেত্রে তাহার অদ্ভূত ক্ষমতা আমাদের গল্পের দৈত্যকেও প্রায় হার মানাইয়াছে। তাহার একার উৎপাদন-ক্ষমতা পৃথিবীর আর চৌদ্দটি শিল্পপ্রধান দেশের মোট উৎপাদন-ক্ষমতার সমান। আর তাহার একটি লোক যাহা উৎপাদন করে, তাহা উৎপাদন করিতে আমাদের পঁচিশটি লোকের প্রয়োজন হয়। তাহার কৃষিও সমান উন্নত। এমন কি প্রথম বিশ্ব-লড়াইয়ের পূর্বে উৎপাদন-ক্ষেত্রে কৃষি হইতে তাহার আয় শিল্প অপেক্ষাও অধিক ছিল। সুতরাং কৃষি ও শিল্পের আদর্শ সমন্বয় সাধিত হইয়াছে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল এই আমেরিকায়। কিন্তু সেখানেও আমরা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার বেকার দেখিতে পাই। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার হইতে জানা যায়, আমাদের এ দেশে ন্যূনকল্পে দুই কোটি লোক সম্পূর্ণ বেকার। জমিহীন কিংবা নামমাত্র জমি-সম্পন্ন অর্ধ-বেকারের সংখ্যা তো অপার। অধ্যক্ষ আগরওয়াল ঠিকই বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য মাপকাঠি দ্বারা বিচার করিলে ভারতের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ কোটি লোককেই বেকার বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও ভারতবর্ষে বিগত ত্রিশ বৎসরে কলকারখানার সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি মোট লোক-সংখ্যার অনুপাতে কারখানার শ্রমিক-সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া বরং কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে

ভারতের মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে কারখানার শ্রমিকসংখ্যা ছিল শতকরা ৫'৫। প্রতি দশ বৎসর অন্তর কমিতে কমিতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪'২ জন, যদিও কারখানা বৃদ্ধি পাইয়াছে চতুর্গুণ। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতের দেশী ও বিদেশী সকল ধনী মিলিয়া দেড় শত বৎসর চেষ্টার পর সমগ্র ভারতের কাপড়ের কলে মাত্র ৪,৩০,১৬৫ জন কর্মী (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে) নিয়োগ করেন; আর সরকারী-বেসরকারী, সভ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিমুখতা সত্ত্বেও গান্ধীজী ও তাঁহার গুটিকয়েক সহকর্মীর বিশ বৎসরের চেষ্টায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র নিখিল-ভারত চরকা-সঙ্ঘের কাজে নিয়োজিত ছিল ২,৬৯,৪৪৫ জন কাটুনী ও তাঁতি। ডক্টর আর. ভি. রাও অনুমান করেন, বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে কাজ করিয়া ভারতে যে পরিমাণ কর্মী জীবিকার উপায় করিতেছে, তাহার পাঁচ গুণ কর্মী ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে।* তিনি তাহার একটি পরিসংখ্যা দিয়াছেন; যথা—বৃহৎ শিল্পে কর্মী-সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৮২ হাজার, ক্ষুদ্র শিল্পে ২ লক্ষ ২৮ হাজার, কুটীরশিল্পে

*The report of the Bombay Economic and Industrial Survey Committee observes, "It is a matter deserving of serious attention that in what is considered to be the most industrial province of India the population engaged in industrial occupation appears to have fallen both absolutely and relative to other occupations. Thus the industrial evolution and modernization of the province has seen the agricultural community suffering in two ways, namely, increasing pressure on land and inrcease in under employment due to loss of subsidiary occupations."

The following table showing the total number of persons "gainfully occupied" and the percentage of persons so occupied in Industry to the total number of persons "gainfully occupied"

৬১ লক্ষ ৪২ হাজার। জাপান প্রধানত ক্ষুদ্রকায় কুটীর শিল্পের দেশ। তাহা দ্বারাই শিল্প-জগতে সে সকলের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চীনের দৃষ্টান্ত আরও বিস্ময়কর। বর্তমান যুদ্ধে তাহার কারখানা-শিল্পের শতকরা আশি ভাগই শত্রু-অধিকৃত, নয়তো বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া একদল কর্মী গ্রামে গ্রামে গেরিলা-সাহায্যে যে ভাবে ক্ষুদ্রাকার শিল্পসমবায় (Industrial Co-operatives) গড়িয়া

---

reproduced from Mr. B. G. Ghate's "Change in the occupational distribution of the population" (Government of India Press) should prove of interest.

Country & year to which the figures relate	Total population gainfully occupied	Total population so occupied in Industry	The percentage of the Industrial population to the total working population.
U. S. A.	Lakhs	Lakhs	
1910	328	107	27·9
1920	416	128	30·8
1930	488	141	28·9
England & Wales			
1911	163	69	42·1
1921	172	55	32·3
1931	189	60	31·7
Germany			
1925	320	122	38·1
1933	323	117	36·2
Japan			
1920	273	53	19·4
1930	292	53	18·1
Canada			
1921	32	8	23·8
1931	39	7	17·3

তুলিয়া তাহারই সাহায্যে শত্রুর সহিত লড়িয়া চলিয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। Industrial Co-operatives আজ সারা বিশ্বে "Indusco" নামে সুপরিচিত। সংস্কারের দাস গান্ধীজী নহেন, আমরাই। তাই ভারতের মুক্তি ও জগতের শান্তি কোন্ পথে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াই স্বার্থান্ধ ধনিক সম্প্রদায়ের ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন্ শ্লোগানের সঙ্গে পোঁ ধরিয়া বসিয়া আছি এবং পল্লীগ্রামে যাইবার ভয়ে গান্ধীজীকে আক্রমণ ও নিজেকে সমর্থন করিবার যুক্তি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

গান্ধীজীর পল্লীপ্রত্যাবর্ত্তন—পাশ্চাত্য মনীষীদের সমর্থন

কিন্তু আমাদের মন্ত্রগুরুরা বাস করেন পশ্চিম দেশে; সুতরাং যুক্তি খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে সেই দিকে তাকাইতে হইবে। এই দুর্বলতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া পাশ্চাত্য নজিরের সাহায্যেই আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation of economy) আজ য়ুরোপেরও ধূয়া। তবেই আশা করি আমাদের শিক্ষিত দেশবাসী উহা কাজে গ্রহণ করিতে না পারিলেও অন্তত বক্তৃতায় গ্রহণ করিতে পারিবেন। সেই চেষ্টাই করা যাক।

যুদ্ধের গুরুতর অবস্থা এবারই আমাদিগকে আত্মরক্ষা ও বিত্ত-রক্ষার তাগিদে ঠেলিয়া গ্রামে ও মফস্বলে পাঠাইয়াছিল। এত সাধের কলিকাতা নগরী পরিত্যাগ করিবার জন্য আমরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলাম। অনেকে দিশাহারা হইয়া আগুপিছু না ভাবিয়া পোঁটলা-পুঁটলি ও পরিবার লইয়া যে কোন রেলে চড়িয়া বসিয়া-

ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আশ্রয়-অভাবে গাছতলায়, নয়তো ষ্টেশনের চালাঘরে দিনরাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ দশা যুদ্ধ-অধ্যুষিত সকল নগরেই লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তাই আজ পশ্চিমেও রব উঠিয়াছে, বৃহৎ নগরীতে অবস্থিত বৃহদাকার শিল্পগুলিকে শত্রুর সহজ লক্ষ্যবস্তু হইতে দেওয়া আর হইবে না— তাহাদিগকে খণ্ডাকারে সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে হইবে। লড়াইয়ের সময় শত্রুর আকাশ-আক্রমণ হইতে আত্ম ও বিত্ত রক্ষার জন্যই যে শুধু ইহা বাঞ্ছনীয় তাহা নহে, দেহের আর সব অঙ্গকে বাদ দিয়া একটি মাত্র অঙ্গের অস্বাভাবিক পুষ্টির মত নগরীর সর্বগ্রাসী অস্বাস্থ্যকর ক্ষুধা ও স্ফীতিকে প্রতিরোধ করিবার জন্যও তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। শুধু প্রয়োজন নয়, ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাবলম্বী সুন্দর পল্লীসমাজ গঠনের যুগই নাকি এখন আসিয়াছে। আমেরিকার সুবিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ Lewis Mumford তাঁহার "Technics and Civilisation" এবং "The Culture" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, অত্যধিক জনসমাকীর্ণ, কারখানায় ঠাসা, বড় বড় শহর বর্তমান যুগে শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে, পরন্তু অচল। অধুনা বৈদ্যুতিক শক্তিসরবরাহ (cheap electricity supply) ও নির্ধারিত আদর্শানুযায়ী পণ্য তৈয়ারির কলাকৌশলের (technique of production of standardised goods-এর) যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাতে অতি সহজেই সমগ্র দেশে বাগানের মত সুন্দর ছোট ছোট অসংখ্য জনপদ সৃষ্টি করিয়া দেশের বাহ্যিক রূপই শুধু নয়, সমাজের আভ্যন্তরীণ চেহারা একেবারে বদলাইয়া দেওয়া সম্ভব। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীন মৃতকল্প পল্লীবাসী সেখানে

নূতন প্রাণস্পন্দনে, নবীন স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় ও গৌরবে জাগিয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে Dr. Willcox-এর "Nations Can Live at Home" পুস্তক হইতেও আমরা অনেক চিন্তার খোরাক পাইতে পারি। কৃষি-বিজ্ঞানের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, অন্য স্থান হইতে খাদ্যশস্য আনয়ন না করিয়া প্রত্যেক দেশ কিংবা পল্লীর পক্ষে নূতন এক প্রকার কৃষি-প্রণালী (novel dirtless farming) দ্বারা স্বল্প আয়াশে, অল্প জমিতে নানা রকমের ফসল অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। এই বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক Prof. Gericke বিশেষ গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

এখন পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ব Biology বর্তমান নাগরিক সভ্যতা সম্বন্ধে কি বলে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। ম্যাল্‌থাস এতকাল আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন যে, অতিপ্রজনন হইতে পৃথিবীতে শীঘ্রই খাদ্যাভাব উপস্থিত হইবে। ইহাই ছিল ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের ধনবিজ্ঞান বা অর্থনীতি। এখন সেই আশঙ্কা কাটিয়া গিয়া বিপরীত আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে—অর্থাৎ ঘন ঘন যুদ্ধ ও অপ্রজননের দরুন মনুষ্যকুলই নির্মূল হইবে কি না এখন উঠিয়াছে এই প্রশ্ন; কারণ বিগত পঞ্চাশ বৎসর পাশ্চাত্য নগরবিলাসীদের মধ্যে লোকসংখ্যা বেশ হ্রাস পাইয়াছে। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেও দেখিতে পাইতেছি যে, শহরের ধনী গৃহস্থের প্রতি মা ষষ্ঠী অনেক সময়ই বড় অকরুণ, অথচ পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ লোকের উপর মার অপার কৃপা। অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার 'ওয়েল্‌থ অব নেশন্‌স'-এ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন:—বিলাসিতা স্ত্রীজাতের মধ্যে প্রায়ই ভোগের বাসনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাদের

সন্তানধারণের ক্ষমতাকে দুর্বল এবং কখনও সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক হগ্‌বেনের মত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ—"শিশুগণ পল্লী-পরিবেশের মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌জগতের সংস্পর্শে আসিয়া সৃষ্টির পৌনঃপুনিকতার (recurrence of parenthood-এর) সহিত পরিচিত হয় এবং জীবের সৃষ্টিধারাকে নৈসর্গিক নিয়মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্য দিকে শহরে যান্ত্রিক অস্তিত্বের শৃঙ্খলিত নিয়মের মধ্যে শিশুর আবির্ভাব একটি অবাঞ্ছিত উপদ্রববিশেষ, যাহার জন্য আবার হাসপাতালের প্রয়োজন। যে যন্ত্র জন্মও দেয় না, কিছু সৃষ্টিও করে না, সে-ই মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক স্থির করিয়া দেয়।" ইহাই যান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম অভিশাপ।

গান্ধীজির ম্যাস প্রোডাক্‌শন

ইকনমিক ইম্পিরিয়্যালিজ্‌ম—অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদেরই বৃহদাকার যন্ত্র, বহু-উৎপাদন এবং সস্তার বাজারে ক্রয় ও চড়া বাজারে বিক্রয়ের নানা ফন্দি-ফিকিরের প্রয়োজন। কিন্তু সার্বজনীন সহযোগিতা সত্যই যাহাদের আদর্শ, লক্ষ্য যাহাদের to live and let live—নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচিতে দেওয়া, জাতিধর্মনির্বিশেষে, শুধু য়ুরোপকে নহে, এশিয়া এবং আফ্রিকাকেও—তাহাদের এই সবের প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস-নিয়োজিত, পণ্ডিত নেহেরু পরিচালিত ভারতীয় ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি এই সম্পর্কে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

"It (the goal) is the attainment of national self-sufficiency for

the Country as a whole without being involved as a result of such efforts in the whirlpool of economic imperialism."

চীনের ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল কো-অপারেটিভ প্রচেষ্টা সম্পর্কে Nym Walesও ঠিক ঐ ধরনের কথাই বলিয়াছেন ঃ—

"It is important that China should not become an imperialist power, nor an instrument for future imperialist conquest. If, instead, the *interior is industrialised on a democratic co-operative basis*, this danger will be removed. Such a healthy, balanced industry will not be competitive abroad, but will raise purchasing power at home and create its own market as well as that for foreign trade on a basis of equality."

গান্ধীজী মনুষ্য সমাজকে শুধু আধ্যাত্মিক সুধা পান করিয়া বাঁচিবার উপদেশ দেন নাই। সেই সুধা তিনি নিজের জন্যই রাখিয়াছেন। আমাদের জন্য তিনি ভোগের পণ্যই চান এবং mass production অর্থাৎ বহু-উৎপাদনই চান। কিন্তু—"But mass production in peoples' own homes. If you multiply individual production to millions of times, would it not give you mass production on a tremendous scale?" পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতায় mass production বা বহু-উৎপাদন বলিতে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে যথাসম্ভব কম লোক দ্বারা বহু পণ্যোৎপাদনই বোঝায়। কিন্তু ইহা যে মানুষের মধ্যে ঘোরতর ধনবৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ এবং ধনিকের হাতে শ্রমিক-শোষণের একটি প্রধান অস্ত্র, তাহা ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষিত অর্থ-শাস্ত্রীরা সাধারণত চাপিয়া গেলেও গান্ধীজী

ধনবিজ্ঞানের পণ্ডিত, না হইয়াও উহা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

"Granting for the moment that the machinery may supply all the needs of humanity, still it would concentrate production in particular areas, so that you would have to go in a round about way to regulate distribution. Whereas, if there is production and distribution both in the respective areas where things are required, it is automatically regulated, and there is less chance for fraud, none for speculation. * * * Distribution can be equalised when production is localised."

যাহারা যন্ত্র-দানবের অপরিসীম শক্তি দেখিয়া তাহার গুণমুগ্ধ ও উপাসক, তাহাদের দুর্বলতা কোথায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। বিরাটত্ব ও অনন্যসাধারণ শক্তির একটা মাদকতাগুণ আছে এবং তাহা স্বভাবতই মানুষকে আকর্ষণ করে। কিন্তু যে শক্তি সৃষ্টি করে কিংবা পালন করে, আর যে শক্তি সংহার করে, উহারা সকলেই শক্তি। আমরা কি ইহাদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ করিব না? আমরা সকলেই কি শুধু সংহারিণী শক্তিকে লইয়াই মত্ত হইব? একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ব্যক্তিগত মুনাফা আধুনিক কালে যন্ত্রদানবের সাহায্য পাইয়াছিল বলিয়াই এতটা রাজনৈতিক জুলুম ও অর্থনৈতিক অসাম্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। যন্ত্র-দানবকে বাদ দিতে পারিলে অর্থাৎ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পল্লীর কুটীরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, আজ ধনিকদের ঐ হিংস্র 'মুনাফা' জন্তুটার অবস্থা হইবে নখদন্তহীন বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের মত এবং উহাকে ভয় করিবার কোন কারণ থাকিবে না। রুশিয়া মুনাফাকে বাদ দিয়া—যন্ত্রকে আস্ত রাখিয়া সুন্দরবনের তাজা

জীয়ন্ত বাঘকে দিয়া জনসেবা করাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং সেইজন্যই এক ভিসাস সার্কেলের সৃষ্টি করিয়া মহা-বিভ্রাটে পড়িয়াছে। এখানে সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা Miss Ethel Mannin-এর "Bread & Roses" পুস্তক হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Whether men work on machine belts, in coal mines, in the stoke-holds of ships, for private employers or the State, is all one so far as the unpleasantness and soullessness of the work itself is concerned, and no socialist or communist manifesto has ever yet protested against this domination of the machine as a destroyer of the Good Life and the Soul of Man, but only against that domination being used for private profit."

উপরে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, দেশের রেল-ষ্টীমার, মোটর, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে (public utility concerns-কে) তুলিয়া দিবার কথা গান্ধীজী কিংবা আর কেহ বলিতেছেন। তাহারা থাকিবে সকলের সেবার জন্য কৃষক-শ্রমিক-শাসিত রাষ্ট্রের অধীনে। কতকগুলি বৃহৎ শিল্পও থাকিবে কুটীরশিল্পের কলকব্জা যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার জন্য। যাহা থাকিবে না, তাহা হইতেছে ভোগের পণ্যসম্পদ সৃষ্টির জন্য দৈত্যাকার কলকারখানাগুলি। ছোট বণিকবৃত্তির সহিত বৃহৎ যন্ত্রদানবের এবং নীচু মনের সহিত উচ্চ বিজ্ঞানের মিলন ও ষড়যন্ত্র দুনিয়ায় যে দুর্নিবার হিংসা, দ্বেষ, কলহ ও পাইকারী হত্যার বন্যা প্রবাহিত করিয়াছে তাহাই নিবারণ করিতে হইবে—কৃষক-শ্রমিক-দলের যন্ত্র-দাসত্ব ঘুচাইয়া, তাহাদিগকে যন্ত্রের প্রভুত্ব (শুধু মালিকত্ব নহে) দান করিয়া। সেইজন্যই যে পল্লী

তাহারা নিজেরা শাসন করিতে পারিবে, যে কল তাহারা নিজেরা পরিচালনা করিতে পারিবে, সেই পল্লী ও সেই কলকে ভিত্তি করিয়া ভারতের সাত লক্ষ পল্লীতে এক লক্ষ (সাতটি গ্রাম লইয়া একটি কেন্দ্র করিলে) স্বাস্থ্যবান স্বাবলম্বী স্বাধীন পল্লী-স্বরাজ গান্ধীজী গড়িয়া তুলিতে চান। রাজধানী, জেলা ও মহকুমার বাবু-সাহেবদের আইন-কানুন-আদেশ আর সেখানে চলিবে না—পক্ষান্তরে তাহাদের আদেশে বাবুসাহেবদের রাজধানী, জেলা ও মহকুমা পরিচালিত হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গান্ধীবাদ ও রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ

আর্থিক বনিয়াদকে শহরকেন্দ্রিক হইতে পল্লীকেন্দ্রিক করার প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছি যে, তাহা করিতে হইলে রাজধানী, জেলা ও মহকুমার বাবু-সাহেবদের ক্লাব-ঘর হইতে ভারতের সাত লক্ষ পল্লীর কুটীরে কুটীরে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তবেই সত্যকার গণতন্ত্র, অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোক-ভুলানো গণতন্ত্র নহে, প্রতিষ্ঠিত হইবে। সোজা কথা এই দাঁড়াইতেছে যে, ধনসাম্যলাভের জন্য অর্থনীতিকে যেমন বিকেন্দ্রীয় করিতে হইবে, তেমনই রাজনীতিকেও হইতে হইবে বিকেন্দ্রিক, গরিবের গণতন্ত্র লাভের জন্য। কারণ রাষ্ট্রশক্তি প্রকৃতপক্ষে জনগণের হাতে না আসিলে অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সাম্যবাদের উপর কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না, যাইলেও রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সেই মৌলিক সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গান্ধীজী ভারতের ভাবী রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাহার পরিচয় দিতেছি :

"...I do not believe in the accepted western form of democracy with its universal voting for parliamentary representatives." Gandhi said.

"What would you have India do ?" I asked.

"There are seven hundred thousand villages in India. Each would be organised according to the will of its citizens, all of them voting. Then there would be seven hundred thousand

votes and not four hundred million. Each village, in other words would have one vote. The villages would elect their district administrations, and the district administrations would elect the provincial administrations, and these in turn would elect a president who would be the national chief executive."

"That is very much like the Soviet system." I said.

"I did not know that," Gandhi admitted, "I don't mind,"—(Louis Fischer's '*A week with Gandhi*').

ইহার অর্থ ঃ প্রত্যেক নরনারীর ভোটের দ্বারা ভারতের পল্লীতে পল্লীতে এক-একটি পল্লী-পঞ্চায়েত গঠিত হইবে। এই সাত লক্ষ স্বাধীন পল্লী-পঞ্চায়েত তাহাদের নিজ নিজ জেলার শাসন-পরিষদ নির্বাচন করিবে। সেই নির্বাচনে জেলার অন্তর্গত পঞ্চায়েতগুলির একটি করিয়া ভোট থাকিবে। জেলা-শাসন-পরিষদগুলি আবার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন করিবে—প্রত্যেকে এক-একটি ভোটের দ্বারা। প্রাদেশিক পরিষদগুলি নির্বাচন করিবে নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রপতিকে। তখন বড়লাট, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও থানার দারোগা, এই পঞ্চ অশ্বিনী সারথি সাজিয়া রাষ্ট্ররথে চড়িয়া জনগণকে তাড়না না করিয়া জনগণ সারথি হইয়া পঞ্চ অশ্বিনীকে রথে জুতিবে ও তাড়না করিবে।

বিস্ময়ের বিষয়, গান্ধীজী সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্রিক কাঠামো সম্বন্ধে কিছু অবগত না থাকিয়াও এই বিষয়ে একই রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এইজন্যই "All great men think alike." (সকল মহৎ ব্যক্তির চিন্তাধারা একই প্রকার) এইরূপ একটি ইংরেজি প্রবাদ-বাক্য চলিয়া আসিয়াছে, এবং এইজন্যই আমি আমার এই বর্তমান আলোচনার একেবারে গোড়াতেই "গান্ধীবাদকে সংক্ষেপে

'গান্ধীয়ান সোশ্যালিজ্ম্' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে" লিখিয়াছিলাম ; (উভয়ের প্রভেদ পরে আলোচ্য)। যদি আমরা জগতে সত্য সত্যই গণরাজ বা গরিব-রাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে নিখিল মানব-সমাজের জন্য স্বাধীনতার চতুর্বর্গ ফল লাভ করিতে চাই—অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সহিত আধুনিক 'ফোর ফ্রীডম' (অভাব ও ভয় হইতে মুক্তি এবং মতের ও ধর্মের স্বাধীনতা) পাইতে চাই, তাহা হইলে রাষ্ট্রশক্তি ও জাতীয় অর্থনীতি, উভয়েরই বিকেন্দ্রীকরণ আশু আবশ্যক। কিন্তু ইহা তো সহজসাধ্য ব্যাপার নহে ; কারণ পল্লীবাসীরা নিঃস্বতা ও মূঢ়তার যে চরম অবস্থায় বাস করিতেছে, তাহা হইতে ধীরে ধীরে ইহাদিগকে মনুষ্যত্বের অধিকার-জ্ঞানের প্রথম সোপানে তুলিতে না পারিলে তো কোন কিছুই সম্ভবপর নয়।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্প্রতি আমেরিকার এক বক্তৃতায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের দেশের পল্লীবাসীরা (২০০ বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পর বিংশ শতাব্দীতে) আজও এমন অবস্থায় রহিয়াছে যে, ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে তাহাদের নিকট ভোটের জন্য উপস্থিত হইলে তাহারা এই ব্যাপারটার কোন অর্থ বা তাৎপর্যই বুঝিতে পারে না। তারপর ভোটপ্রার্থীদের মধ্যে কোন্ দলের কোন্ নীতি ও কিরূপ কর্মধারা এবং তাহাদের পক্ষে কোন্‌টার কিরূপ ফলাফল, তাহাও কল্পনা করিতে পারে না। তাহাদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণ যে তাহাদের মতামত ও নির্দেশের অধীন, তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলামঙ্গলের জন্য শাসক-দরবারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য দায়ী, এমন কি শাসকবর্গ যে তাহাদেরই অর্থে নিয়োজিত তাহাদেরই

'ভৃত্য', তাহাদের, অবস্থার সর্বপ্রকার উন্নতিসাধন করিতে এবং সর্বপ্রকার ক্ষতি নিবারণ করিতে সর্বতোভাবে বাধ্য—এইরূপ ধারণা তাহাদের স্বপ্নেও আসে না। আসিবেই বা কি করিয়া! জন্মাবধি আমরণ যেখানে "ভৃত্যে"রা তাহাদের উপর অপ্রতিহত প্রভুত্বই পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন, ভৃত্যের চরম পরিচয় যেখানে চিঠি বা সমনের তলাকার "আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য" এই নিষ্ঠুর পরিহাসটুকুর মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেখানে ইহার বেশি আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার সুপরিচিত সাহিত্যিক নিখিল ভারত-ভ্রমণ করিয়া এ দেশবাসীর দুরবস্থার যে এক করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা রয়টারের ১৯৪৫।২৩এ জুন তারিখের এক সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি কিছু মাত্র অতিরঞ্জিত নহে, যদিও আমাদের হৃদয় নাই বলিয়া আমরা চোখ থাকিতেও দেখিতে পাই না। কিংবা বিদেশী স্বার্থের সহিত নিজ স্বার্থকে সংযুক্ত করিয়া কিছু-কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির পরম পরিতুষ্টিতে আমরা দুর্ভাগা দেশবাসীর অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতচেতন। তাই আমাদের চৈতন্যোদয়ের জন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"For all our lives we will retain in our memory the pitiful sight of hungry, people with carved-in chests, legs thin as sticks and ribs sticking through their skins and crippled by disease... Human labour is the cheapest thing in India. To have a couple of servants here is bad form—there must be at least dozen of them...There are trains for the Indian people moving at not more than 15 milimetres an hour and special express trains for

the whites with air-cooling and baths in every carriage. This is fairy tale India—rich and poor."

সত্যদ্রষ্টা ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথও এই করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এবং তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া তাঁহার প্রাণস্পর্শী অমর লেখনী দ্বারা আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ঃ—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ-কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"

এই তো আমাদের দেশ, এই তো আমাদের সত্যকার স্বরূপ! সেদিন ১৩৫০-এর মন্বন্তরে আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া ৪০।৫০ লক্ষ নগ্ন কঙ্কাল প্রাণাধিক আত্মজনের হাত ধরিয়া নীরবে নিঃশব্দে জীবনের এপার হইতে মৃত্যুর ওপারে চলিয়া গেল! ইহাদের বুভুক্ষু উদরে একমুষ্টি অন্ন, বিবস্ত্র দেহে একখণ্ড বসন দিতে হইলে, ইহাদের মূঢ়

ম্লান মূক মুখে ভাষা, এবং শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা ধ্বনিয়া তুলিতে হইলে, শহরে বসিয়া বাবু-সাহেবদের ভারত-উদ্ধারের শখের প্ল্যান তৈয়ারি করিলে কিছুই হইবে না। ১৭½ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী বিশাল ভারতের গোটাকয়েক শহরে গুটি শতেক মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহারা ৩০ কোটী নর-নারীর এই চেহারা ফিরাইয়া দিবার প্রত্যাশা করে, এই দৃশ্যপট পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর স্বার্থান্ধ হৃদয়হীন মূঢ় কল্পনা করাও কঠিন। কোটী কোটী দেশবাসীর এই চরম দুর্গতি সম্বন্ধে ইহাদের চিত্তে যদি বিন্দুমাত্র সহজাত বেদনা-বোধ থাকিত, তাহা হইলে ইহারা ঘরে বসিয়া সস্তা আত্ম-প্রসাদ ও আত্ম-প্রচার লাভের জন্য মানুষের এত বড় দুর্ভাগ্যকে লইয়া প্ল্যান তৈয়ারির নামে এইভাবে শব্দবিন্যাসের (word-making-এর) খেলা খেলিতে পারিতেন না। কাজ না করিতে পারেন, অন্তত অকাজ করিয়া সকলকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেন না।

এখন প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় কি? ইহার জবাব পূর্বেই দিয়াছি। উপায়ঃ—রাষ্ট্রশক্তির ও শিল্পব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ। বুঝিলাম, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ না হইলে উহাই বা সম্ভবপর হইবে কি প্রকারে? তাহার উত্তর—সেই স্বাধীনতার জন্যই গান্ধীজীর পল্লী-সংগঠনের চতুর্দশ কর্মধারা। অন্যথা ভারতের সাত লক্ষ জরাজীর্ণ পল্লীর কোটী কোটী নর-কঙ্কালের মধ্যে মানুষের ন্যায় বাঁচিবার মত মানসিক বল ও ভরসা সঞ্চারিত করিতে না পারিলে স্বাধীনতার জন্য লড়িবার লোক পাওয়া যাইবে কোথায়? কারণ আমাদের মত বাকি যাহারা রহিল, তাহাদের প্রায় সবাই তো অপর পক্ষের ক্রীতদাস। সেইজন্য প্রথমেই পল্লীবাসীদের মধ্যে

মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বনিয়াদ তৈয়ারি করিতে হইবে। গান্ধীজীর নিখিল-ভারত-চরকা-সঙ্ঘ, পল্লী-শিল্প-সঙ্ঘ, হিন্দুস্থানী-তালিমি-সঙ্ঘ প্রভৃতি তাঁহার সেই গণ-স্বরাজেরই ভিত্তি-স্থাপনার আয়োজন মাত্র। এই দিক দিয়া যদি আমরা কিছুটা সফলতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে "স্বরাজ" আপনি আসিবে, তাহার জন্য কাহাকেও আর বিশেষ লড়িতে হইবে না। সেইদিন আমরা সত্যই দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারিব—

"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সঙ্কোচ সত্রাসে যাবে মিশে।"

Miss E. Mannin'ও সেই কথাই বলিয়াছেন: "The masses, the world over, do not have to seize power, since it is by their toil that the wheels go round and the earth brings forth ; this is their power ; their strength lies in their realisation of it. With the withdrawal of their co-operation the whole machinery of the social system ceases to function. The power of moral force has not yet been fully tried out, though in India, one old, frail man has demonstrated its potentialities .."—*Bread & Roses* by E. Mannin. সুতরাং violence ও non-violence এর বিতর্ক ভারতের বর্তমান অবস্থায় অনেকখানি অবান্তর। তা' ছাড়া, ক্রীড্ হিসাবে স্বীকার করিতে বাধিলেও, অনেকের পলিসি হিসাবে ইহাকে না মানিয়া আমাদের উপায় নাই। সে কথা এখন থাক্।

দেশের দুর্গতি দেখিয়া বড় দুঃখে একদিন বাংলার কবি গাহিয়াছিলেন ঃ—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।"

কবির সেই খেদোক্তিকে আজ একটু পরিবর্তন করিয়া বলিতে হইবে ঃ—

না জাগিলে সব পল্লী-সন্তান,
মাতৃ-ভূমি তব কে করিবে ত্রাণ ?"

পরাধীনতার এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ভারত-ললনাদের যতটুকু শিক্ষালাভ ও জাগরণ সম্ভব তাহা হইয়াছে। ইহার অধিক জাগরণ বর্তমান অবস্থায় আর আশা করা যায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন চারিদিক হইতে উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে পল্লী-জাগরণের নূতন ধুয়ার। তাহার বরাত রহিল বাংলার স্বদেশ-প্রেমিক যোগ্য কবিদের নিকট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই আবার বলি ঃ—

---

* বাবু-সাহেব আছেন যত
নিজ ব্যসনে সবাই রত,
তারা নহেন পশ্চাৎপদ
মায়ের বুকে, ভায়ের পিঠে হানিতে কৃপাণ:
ছেড়ে দিয়ে সব লোভ হিংসা
পরচর্চা, পরকুৎসা
বুকে নিয়ে প্রেম-ভালবাসা
পল্লীমায়ের সেবা মোদের হউক ধ্যানজ্ঞান।
"কৃষাণের জীবনের সরিক যেজন,
কর্মেও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

গান্ধীবাদ এবং মোটা কাপড় মোটা ভাত

জীবনযাত্রার উচ্চমানের অজুহাতে নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া বাহুল্যবিলাসে আত্ম-সমর্পণ—পাশ্চাত্য সভ্যতার এই যে আধুনিক নীতি, ইহাতে গান্ধীজী বিশ্বাসী নহেন—"প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং" এই প্রাচীন নীতিই তাঁহার আদর্শ। এই আদর্শ তাঁহার নিকট শুধু আদর্শ নয়, ইহাকে তিনি নিজ জীবনে পুরাপুরিভাবে গ্রহণ ও পালন করিয়া আসিতেছেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর নহে, একজন বিশ্ব-বিশ্রুত পলিটিসিয়ানের জীবন যে কতখানি সরল ও অনাড়ম্বর হইতে পারে, তাহা নিজ জীবন দিয়া তিনি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ড্রয়িং-রুম-স্থইট কিংবা ডাইনিং-রুম-ক্রকারি কিংবা মোটরগাড়ির মূল্য দিয়া যে মানুষের মূল্যের পরিমাপ করা যায় না, এই সহজ ও শাশ্বত সত্যকে আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলাম, চারিদিকে চোখ-ঝলসানো ঐশ্বর্যের উদ্ধত আত্মপ্রকাশ দেখিয়া। কটিবাস-পরিহিত নির্বিত্ত বিশ্ববিজয়ী ফকির চোখে আঙুল দিয়া আমাদের সংবিৎ ফিরাইয়া দিয়াছেন। আমরা বুঝিয়াছি, তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র ও ত্যাগ সুদুর্লভ এবং সর্বসাধারণের সাধ্যাতীত হইলেও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব বাস করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের শৃঙ্খলা ও নীতি, পরিচ্ছন্নতা ও মননশীলতার মধ্যে, প্রতিবেশীর সহিত সহযোগিতায়—শেষ পর্যায়ে, সত্য ও অহিংসায়। নাইট-ক্লাবের মদের বিলে কিংবা ব্রিজ ও ফ্লাসের হার-জিতের টাকার অঙ্কে নয়। সত্য কথা বলিতে কি, ধনিকের মুনাফা বজায় রাখিবার জন্যই জীবনযাত্রার মান (standard of living) উচ্চ হইতে উচ্চতর করিবার দোহাই দিয়া মানুষকে জাহান্নামে পাঠাইবার অর্থশাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। যতই

একদল লোকের 'মান' উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়াছে, ততই তাহাদের অর্থগৃধ্নুতা ও ভোগস্পৃহা অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে এবং দুনিয়ার আর একদল লোকের 'মান' নিম্ন হইতে নিম্নে নামিয়াছে। উচ্চতর 'মান' ও উচ্চতর মুনাফা আজ ইহাদিগকে টানিতে টানিতে এমন এক স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে যে, তাহা বজায় রাখিতে এখন ঘন ঘন বিশ্ব-লড়াইয়ের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ লড়াই আরও ঘন হইলে মুনাফার অঙ্ক যে কোম্পানির খাতায়ই জমা থাকিয়া যাইবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার মত অবস্থাও আজ ইহাদের নাই। ধনিক-পৃষ্ঠপোষিত অর্থশাস্ত্রীরা অবশ্য বলিয়া থাকেন, বড়লোকের ভোগবিলাসের অনুকূল হাওয়া না পাইলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প এরূপ দ্রুত উন্নতি-লাভ করিতে পারিত না। ইহাদের কথা মানিয়া লইলেও আমরা আজ এ কথা ইহাদিগকে বলিতে পারি: বেশ, স্বীকার করিলাম 'মান' বাড়াইয়া তোমরা শিল্পোন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছ। কিন্তু আর কোথায় যাইবে? এখন তো সম্মুখে অসীম শূন্যতা, অতলস্পর্শ গহ্বর। এবার ক্ষান্ত দাও, ফিরিয়া চল,—ভয় নাই, আদিম যুগের আদ্য অবস্থায় নয়,—সভ্যতার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যাহা পাইয়াছ এবং যাহা হারাইয়াছ তাহারই একটা হিসাবনিকাশ করিবার জন্য, এবং ভুলভ্রান্তি, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়ের ব্যাল্যান্স টানিয়া নূতন করিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরের পথ বাছিয়া লইবার

সত্যই গান্ধীজীর আহ্বান বর্বর যুগে ফিরিয়া যাইবার আহ্বান নয়। তাঁহার পথ জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পবিরোধী, সভ্যতা-বিমুখ পথও নয়। তাঁহার পথ হতচেতন মনুষ্যত্বের পুনরুজ্জীবনেরই পথ, দেহ ও

আত্মার সামঞ্জস্যের পথ—পরম শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে সকলে মিলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার পথ। তাই গান্ধীজী সর্বাগ্রে সকল মানুষের জন্য মোটা কাপড় ও মোটা ভাতের ব্যবস্থা করিতে চান। ভোগৈশ্বর্যের যাহা খুশি তাহাই হউক, তাঁহার অর্থ-শাস্ত্রে অন্ন ও বস্ত্র হইবে ভগবানের জল-বায়ুর মত সুলভ ও সহজ প্রাপ্য। মানবের জীবন-ধারণের এই প্রাথমিক সম্পদ দুইটিকে রাখিতে হইবে মানুষের দুর্লোভের নাগালের বাহিরে,—যাহাতে অর্থের জোরে ইহাদিগকে গুদামে অবরুদ্ধ করিয়া পচাইয়া ৫৲ টাকার চাল ৫০৲ টাকায় এবং ২৲ টাকার কাপড় ২০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ধনী বণিক ও রাজ-কর্মচারী মিলিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে বিবস্ত্র করিয়া হত্যা করিতে না পারে। তাই অন্ন ও বস্ত্র লইয়া কাহাকেও ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে না। গান্ধীজী যে কত বড় সোশ্যালিষ্ট, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আর এই নির্দেশ তাঁহার আজিকার নয়, বহু পূর্বের। কিন্তু তাঁহার সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের হাতে এ সব তুলিয়া দেওয়া হইবে না—যে পর্যন্ত রাজ-অমাত্যবর্গ বিদেশী ও দেশী ধনিকের গুপ্তচর ও ভৃত্য—জনসাধারণের কেহ নহে। এইবার তাঁহার নিজের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"According to me the economic constitution of India, and, for the matter of that, the world should be such that no one under it should suffer from want of food and clothing...And this ideal can be universally realised only if the means of production of the elementary necessaries of life remain in the control of the masses. *These should be freely available to all as God's air and water are or ought to be ; they should not be made a vehicle of traffic for the exploitation of others. Their monopolisation by any country,*

nation or group of persons would be unjust. The neglect of this simple principle is the cause of destitution that we witness to-day not only in this unhappy land but other parts of the world too."

মোটা কাপড়, মোটা ভাত! তাহারই সংস্থানের জন্য দেশব্যাপী গান্ধী-প্রচেষ্টা! অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য দাবি! আমরা যে ইহা অপেক্ষা ঢের বৃহৎ কাজ করিতে চাই। দরকার হইলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে চাই। কি বলিলেন, প্রাণ দিতে হইবে না? শুধু পল্লীতে বসিয়া পল্লীবাসীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবনকে সম্ভোগ করিতে হইবে? বুঝিলাম, কিন্তু এত ছোট কাজে আনন্দ কই?

রক্তোচ্ছ্বাসের ক্ষণিক মিষ্ট আমেজ, দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠার সহজ আনন্দ ইহাতে নাই, সত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে গভীর মনন-শীলতা ও হৃদয়বত্তা এবং স্থির আদর্শের প্রতি নিয়মানুগ নিষ্ঠার অবিচলিত বজ্রদৃঢ়তা আছে, যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আজও ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। মানবসেবা হইতে, সৃষ্টী ধারণ করিবার উপলব্ধি হইতে যে গভীর আনন্দ ও রসানুভূতি তাহা যাঁহারা পাইতে চান, তাঁহাদের জন্য গান্ধীজীর এই সহজ, সরল, সত্য পথ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমাজ-তন্ত্রে ও গান্ধী-তন্ত্রে স্বাধীন কর্মোদ্যম ও সম্পত্তির স্থান

সমাজতন্ত্রের গোড়ার কথা হইতেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার স্থান তাহাতে থাকিবে না। সকল কারখানা ও ভূমির মালিকীস্বত্ব হইবে রাষ্ট্রের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও রাষ্ট্রই পরিচালনা করিবে—স্বাধীন কর্মোদ্যম সেখানে থাকিবে না, সকলে রাষ্ট্রের অধীনে বেতনভোগী শ্রমিক বা আমলা হিসাবে কাজ করিবে মাত্র। এই নীতির গোড়ার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, অভিজাত ও অন্ত্যজ, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত—এই যে দুইপ্রকার বিসদৃশ অসম শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মূলোৎপাটন করিয়া সকল মানুষকে একই প্রকারের আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক শক্তি ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। উচ্চ-নীচের প্রভেদ সূচিত হইতে পারে এমন কোন পদবী, খেতাব বা সম্বোধন পর্যন্ত ঐ রাজ্যে চলিতে পারিবে না। ধর্মযাজকগণ রাজনৈতিক জুলুমের প্রতিবাদ না করিয়া শক্তিশালী অত্যাচারী রাজশক্তিকে সর্বদা সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের বৃত্তিভোগী দাস হিসাবে এবং নীরবে সকল অত্যাচার উৎপীড়নকে সহ্য করিবার শক্তিকে ধর্মের গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই ধর্মকেও এই নূতন সমাজে থাকিতে দেওয়া হইবে না। এমন কি কোমল হৃদয়বৃত্তি, ভাবপ্রবণতা, প্রচলিত হিতোপদেশ বা নীতিশাস্ত্র পাছে মানুষের মনকে দুর্বল করিয়া পুরাতন সংস্কারের দাস

করিয়া ফেলে সেইজন্য তাহাদিগকেও স্বীকার করা বা কোন প্রকারে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। একখানা পোষ্ট-কার্ড ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া পুরাতন স্ত্রী বা স্বামীকে পরিত্যাগ করা এবং পাঁচ মিনিটের জন্য রেজিষ্টারী অফিসে যাইয়া নূতন স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করা চলিবে। প্রেমকে স্বীকার করা হইবে না, নর-নারীর মধ্যে শুধু যৌন সম্বন্ধকে স্বীকার করা হইবে এবং সেই সম্বন্ধ যে সর্বসংস্কার ও দুর্বলতা হইতে মুক্ত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে দলবদ্ধ হইয়া তরুণীর সম্ভ্রম নষ্ট করিতে হইবে (মরিস হিণ্ডাসের মাদার রাশিয়া পৃঃ ২১৫)। টলষ্টয়-পুস্‌কিন-শেখ্‌ভের অমর সাহিত্যকে বর্জন করিতে হইবে, কি জানি যদি ইহা হইতে পুরাতন "দুর্বল" মনোবৃত্তি ও রস-সঞ্চার হইতে শুরু করে! ধনতান্ত্রিক সমাজের দুর্নীতি ও অত্যাচার, খলতা ও হৃদয়হীনতার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হিসাবেই অতীতের সব কিছুর বিরুদ্ধে কি নিদারুণ বিদ্রোহ! কিন্তু এই বিদ্রোহ ভীষণ প্রতিহিংসার মধ্য দিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আবার আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে—পেণ্ডুলামের কাঁটা আবার বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য, যাহা বুর্জুয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বলিয়া সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই নূতন করিয়া নূতন উদ্যমে প্রচার করা হইতেছে, রাজরাজড়াদের বীরত্ব-কাহিনীও তাহা হইতে আর বাদ পড়িতেছে না। বিশ্বজনীনতা কিংবা আন্তর্জাতিকতা যে আদর্শের মূল ছিল, সেখানে এখন উগ্র রকমের জাতীয়তাবাদ চলিয়াছে। সুনাম রক্ষার প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায় মুখে যতটুকু আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বকল্যাণের কথা না

বলিলে নয় সেইটুকুই এখন আছে। রুশিয়াও আজ উচ্চ কণ্ঠে জার্মানীর নিকট সর্বোচ্চহারে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতেছে। ইহার অর্থ জার্মানীর কৃষক ও শ্রমিককুলকে বহুকাল পরম দুর্গতি ভোগ করিয়া দাসত্বের দ্বারা এই বিরাট ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে! নাজী পার্টিকে সমূলে ধ্বংশ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু "বিশ্বের কৃষক-শ্রমিক এক হও" সমাজ-তন্ত্রের এই মূল শ্লোগানের সহিত, এক দেশের কৃষক-শ্রমিক (তাহাদের শাসক শ্রেণীর অপরাধে) অপর দেশের কৃষক-শ্রমিকের দাসত্ব করিবে, এইরূপ আচরণের সামঞ্জস্য বিধান, আত্মরক্ষা কিংবা এক্সপিডিয়েন্সির দোহাই দিয়াও করা কঠিন। এইরূপ মনোবৃত্তি ও যুক্তি অ্যাংলো-আমেরিকার মুখেই শোভা পায়।

সোভিয়েট রুশিয়ায় ধন-বৈষম্যও আবার ফিরিয়া আসিতেছে। প্রভেদ এই—ইহারা পুরাতন অভিজাত ধনী-সম্প্রদায় নহে, প্রলিটেরিয়েট সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত নূতন একদল—যৌথ-কৃষি-প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ কলকারখানার ম্যানেজার ও ডিরেক্টারগণ। এই নূতন ধনীদের আবার এক নূতন রকমের সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। সেই সমস্যা হইতেছে কি ভাবে নিজস্ব অর্থ ব্যয় কিংবা নিয়োজিত করা হইবে। কারণ প্রচলিত দুইটি পথই তাহাদের নিকট এক প্রকার অবরুদ্ধ। দেশের ভিতর ক্রয়ের বরাদ্দ সীমাবদ্ধ, বিদেশ হইতে স্বাধীনভাবে পণ্যক্রয় নিষিদ্ধ। সরকারী সুদী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যদি স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটান, ইচ্ছামত বাগানবাড়ী, জমিদারী, মোটরগাড়ী কিংবা আর কিছু মনোহারী ক্রয় করিয়া ব্যয় করা না

যায়, তাহা হইলে সেই অর্থও ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া নানা কুমন্ত্রণার মন্ত্রী 'হইয়া বসিবে। জড়বাদী সমাজতন্ত্রে সূক্ষ্মতত্ত্বের বা আধ্যাত্মিক আনন্দের স্থান নাই। সুতরাং সেই পথে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের পথও সুগম নয়। এদিকে রুশিয়ার কোন কোন শিল্পে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন শুরু হইয়াছে। একদিকে অব্যবহার্য ও অনাচরণীয় অর্থের প্রাচুর্য, অন্যদিকে ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদনের আধিক্য। ইহার পরিণাম সম্ভবত ধনতান্ত্রিক পন্থায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনঃ পত্তন—অর্থাৎ উৎপাদন শুধু দেশবাসীর ভোগের জন্য, অর্থের বিনিময়ে মুনাফার আশায় সর্বত্র বিক্রয়ের জন্য নহে, এই সমাজতান্ত্রিক নীতির পরিবর্তন। ইহার অর্থ—ধনতন্ত্রের প্রথম ধাপে সমাজতন্ত্রের পুনঃ প্রত্যাবর্তন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তারপরের ধাপে পুরাপুরি সাম্রাজ্যবাদ ও লড়াই। অবশ্য এই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে পুনর্মূষিক হইতে না হয় তাহার চেষ্টা ইহারা নিশ্চয়ই করিবে। কিন্তু প্রতিকূল হাওয়া যে ভাবে বহিতে শুরু করিয়াছে তাহাতে ইহাদের এই চেষ্টা কতদূর সফল হইবে তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সন্দেহের কারণ বলিতেছি। ইহারা ছাঁচে ফেলিয়া লৌহ ঢালাই করার মত মানুষ ও সমাজ গড়িতে চাহিয়াছিল এবং তাহার জন্য পূর্বাহ্নেই কয়েকটি প্রতিজ্ঞাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লয়। যথা, (১) দুনিয়ার মানব-সমাজে মাত্র দুই শ্রেণীর মানুষ বাস করে—ধনিক ও শ্রমিক এবং একে অপরের উপর জুলুম করে। ইহা ছাড়া আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। (২) মানব-জাতি আদিকাল হইতে আধুনিক কাল

পর্যন্ত দৈহিক ক্ষুধা সর্বস্ব এবং মানব-সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস হইতেছে মানুষের জীবন-সংগ্রামেরই ইতিহাস মাত্র। ইহার মধ্যে অধ্যাত্মবাদের, আত্মিক ক্ষুধার কিংবা অন্য কোন প্রকার মানসিক ও নৈতিক বৃত্তির প্রভাব বা স্থান নাই। (৩) মানুষের মধ্যে অসাম্য কোন প্রকারেই প্রকৃতিগত বা মৌলিক নহে—সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ব্যবস্থার ফল। বর্তমান অসঙ্গত সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে পুরাপুরি ও স্থায়ী সাম্যলাভ সম্ভবপর। (৪) উদ্দেশ্য মহৎ হইলে সকল পথই পথ—সেখানে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার অনাবশ্যক। অর্থাৎ the end justifies the means. (৫) Sense of possession বা "আমার"-জ্ঞানকে সর্বসাধারণের মন হইতে সমূলে উৎপাটন সম্ভব।

এই সব প্রতিজ্ঞার সত্যতার উপর ভিত্তি করিয়া ইহারা একদিন গোপনতার গভীর অন্ধকারে এক ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি বলপূর্বক গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রের উপর তাহাদের মালিকীস্বত্ব আরোপ করিয়া সকল মানুষকে এক স্তরে নামাইয়া একটি সমান রেখা হইতে সকলে এক সাথে নূতন পথে নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করেন। এতদিন যে জীবন-দৌড় চলিয়াছিল তাহাতে কেহ ছিলেন দু'চাকার পা-গাড়ীর উপর, কেহ অশ্ব-যানে, কেহ বা হাওয়া গাড়ীতে, আবার কেহ আকাশ-রথে। তার মধ্যে এক বিরাট হতভাগ্যের দল যাদের সম্বল মাত্র দু'খানা ল্যাগব্যাগে ঠ্যাং। তার উপর, কেহ দশ মাইল, কেহ বিশ মাইল, কেহ বা পঞ্চাশ মাইল আগাইয়া রহিয়াছেন। তারপর—ওয়ান, টু-উ-উ, থ্রি। ব্যস, দৌড় শুরু। কিন্তু হায়! হতভাগ্য পদাতিকরা কি করিয়া

অপর দলের সঙ্গে দৌড়াইয়া পারিবে। জীবন-সংগ্রামে এ রকম অবিচার অসহনীয় ও অমার্জনীয় সন্দেহ নাই। মার্কস্-এঙ্গেলস-লেনিন ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে পদাতিক-দের জন্য নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে, যাহারা বহু আগে চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের টানিয়া আনিয়া পিছনে সকলের সঙ্গে সারবন্দী করিয়া এক সঙ্গে যখন স্টার্ট দিলাম তখনও যে একদল অপর অনেককে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া যাইতেছে এবং সম্মুখে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর যাহা পাইতেছে তাহাতে চড়িয়া বসিয়া পিছনের সহিত ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। সমান সুযোগ চাহিয়াছিলাম, পাইয়াছি। ইহা যে বঞ্চিতের দল কোথাও কোনদিন পাইবে আশা ছিল না। বহু ধন্যবাদ রুশ-বিপ্লবকে। কিন্তু এ কি! এই অপূর্ব অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাইবার পরও তাহার সুফল আমাদের হাত হইতে এমন করিয়া ফস্‌কাইয়া যাইতেছে কেন? ইহাতে বিস্মিত হইবার বিশেষ কারণ নাই; যেহেতু সকল মানুষকে সমান সুযোগ দান করা এবং সকলকে সর্বকালের জন্য জোর করিয়া সমান করিয়া রাখা এক জিনিষ নহে। প্রথমটি বর্তমান কালের সর্বপ্রধান দাবী—এবং সকল সমাজের আশু ও অবশ্য পালনীয়। দ্বিতীয়টি কিন্তু দুষ্পালনীয় ও দুঃসাধ্য। তাহা করিতে হইলে চীন দেশের মেয়েদের চরণ কমলকে ক্ষুদ্রাকৃতি বা পদ্মাকৃতি করিবার জন্য যে লৌহ-পাদুকার ব্যবস্থা আছে সেইরূপ লৌহ-নিগড়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবেই সম্ভবত সকল পদের ন্যায় সকল শিরও সমান থাকিবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রকৃতির প্রতিকূলে এই লড়াই টিকিবে কি এবং তাহা

হইতে বাঞ্ছিত সুফলই বা পাওয়া যাইবে কি? সেইজন্যই গান্ধীজী প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন :—

"My ideal is equal distribution, but so far as I can see, it is not to be realised. I, therefore, work for equitable distribution." ইহাও বলিয়াছেন :—"The idea of inequality, of 'high and low' is an evil, but I do not believe in eradicating evil from the human breast at the point of the bayonet. The human breast does not lend itself to that means."

মোটকথা, inequalityকে সম্পূর্ণ দূর করা, সকল মানুষের কর্মক্ষমতা, অর্থোপায় ও প্রতিপত্তিকে একেবারে একই স্তরে নিশ্চল স্থির করিয়া ধরিয়া রাখা, কখনো সম্ভব নহে। ইহাদের অত্যাচারকে দূর করা সম্ভব এবং অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাহা জোর করিয়া পাশবিক বা সশস্ত্র বলের সাহায্যে সম্পন্ন করিতে গেলে সাময়িক ফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার শেষ পরিণাম শুভ হইবে বলিয়া গান্ধীজী বিশ্বাস করেন না, আমরাও করি না।

মানব-সমাজ মাত্র দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—ধনিক ও শ্রমিক, এই অব্‌সেসন বা ভাবাবেশ সোশ্যালিজ্‌ম চিন্তাধারার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টির জন্য অনেকখানি দায়ী। কারণ ইহা য়ুরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের পর শ্রমিকের উপর ধনিকের একাধিপত্য ও তাহার অসহায় দাসজীবনের বিষময় কুফল দর্শনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইলেও, মূলত সত্য নহে। বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন অবস্থার অগণিত মানুষের যদি কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ সম্ভব হয়, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উক্ত গুণ ও কর্মদ্বারা নির্ণীত চতুর্বর্ণ ই সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বিভাগ। চতুর্বর্ণ না হইয়া অষ্ট বর্ণ

হইলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ শ্রেণীবৃদ্ধিতে মানবের বিচিত্র ও বহুমুখী কর্মধারাকেই স্বীকার করা হয়। কিন্তু ক্ষতি তখনই ঘটে যখন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তাহার অধীনস্থ সকল মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক আত্ম-অভিব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বা সুযোগ দান করিতে পারে না।

বুর্জুয়া ও প্রলিটেরিয়েট এই দুইটি দলের মধ্যে বুর্জুয়া দলটিকে সমূলে ধ্বংশ করিতে পারিলেই জগতে আর একটি মাত্র দল থাকিবে এবং তাহা হইলেই সম্পুর্ণ ইক্ওয়ালিটির উপর দলবিহীন (classless) সম্পত্তিবিহীন আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে—সাম্যবাদীদের এই লক্ষ্য রুশিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়া আদিতে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল সত্য। কিন্তু তারপর?—একদল ধনী গিয়াছে, আর একদল নূতন ধনী সৃষ্টি হইতেছে। 'জার' সবংশে নিহত হইয়াছে, 'জার' অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী এক-নায়ক রাষ্ট্রপতি তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। 'আমার' বলিতে কিছু নাই বলিয়া মরুভূমির মত বুক ধুধু, প্রাণ হাহাকার করিতেছিল—স্নেহ-প্রীতি ঢালিবার, যত্ন-সেবা করিবার, সুন্দর করিয়া সাজাইবার নিজস্ব কিছু খুঁজিয়া পাইতে-ছিলাম না, এখন আবার আমার গরু, আমার মুরগী, আমার বাগান, আমার বাড়ী ফিরিয়া পাইয়াছি। আমার মোটর, আমার ব্যাঙ্কের পাসবইও পাইয়াছি। ধর্মকে অস্বীকার করিয়াছিলাম, নীতিকে বাদ দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু গত লড়াইয়ের সময় বিপাকে ফেলিয়া আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আমাদের ছত্রপতিকে দিয়া 'রাম' নাম লওয়াইয়া ছাড়িয়াছেন। অক্টোবর রেভোলিউশনের পূর্বেকার

ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলাম, এখন তাহা লইয়াই মাতামাতি করিতেছি এবং উগ্র জাতীয়তার নূতন খোরাক যোগাইবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের শরণাপন্ন হইয়াছি। সত্যকার ডিমক্রেশী চাহিয়াছিলাম, যেখানে মানুষ স্ব স্ব প্রধান হইয়াও স্বতঃউৎসারিত প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্যে সংযমী ও নিয়মানুবর্তী হইয়া বাস করিবে, যেখানে রাষ্ট্রের আর আবশ্যক হইবে না—রাষ্ট্র আপনা হইতে শুকনা পাতার মত ঝরিয়া পড়িবে ("shall wither away"); কিন্তু পাইয়াছি অতি দুর্ধর্ষ ডিক্‌টেটারশিপ। চাহিয়াছিলাম দেশে দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া দুনিয়ার কৃষক-শ্রমিকের দুঃখ হরণ করিতে, এখন দেখিতেছি অ্যাংলো-আমেরিকার মন রাখিতে সে পথে যাইবার উপায় নাই। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংশ করিব, প্রলিটেরিয়েটের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিব, এই ছিল আমাদের পণ; কিন্তু এমনই অদৃষ্টের ফের, এখন দেখিতেছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী আমার দোস্ত। ভাবিয়াছিলাম নিজ দেশের কৃষক-শ্রমিকদের অন্তত খানিকটা বিশ্রাম ও শান্তি দিতে পারিব, কিন্তু লড়াইয়ের জন্য পারিলাম কৈ? পরেও যে পারিব তাহার ভরসাই বা কোথায়? কারণ আজকার দোস্ত যে কাল্‌কার দুশমন নয়, সেই বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছি কৈ? সেই-জন্যই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অবস্থার চাপে কিছু কিছু আদর্শ ছাড়িতে হইতেছে। কি করিব? ইহাই পাশ্চাত্য রাজনীতি। আগে আপন প্রাণ, তবে ত জগৎ-ত্রাণ। বুঝিলাম। কিন্তু এরকম ভয় (fear complex), অবিশ্বাস এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিযোগিতার মধ্যে শেষ পর্যন্ত আদর্শের আর কিছু বাকি থাকিবে কি?

সত্যকে ছাড়িয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির অর্থাৎ 'পাওয়ার

পলিটিক্সের' পথে গেলে শেষ পর্যন্ত সকলের ভাগ্যে ঐ একই গতি। সমাজ-তন্ত্রের মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্যের দোহাই দিয়াও লড়াই ও তাহার আনুষঙ্গিক ভয়াবহ পরিণামের হাত হইতে আর তখন বাঁচিবার উপায় থাকে না। অহিংসার কথা আর এখানে তুলিব না, কারণ তাহাতে আমাদের বিচারশীল বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক বিবেক অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইবে এবং বিতর্ক আরো অনেক বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু সত্যের কথা না তুলিয়া পারিলাম না, যদিও প্র্যাকটিকাল ম্যান্ হিসাবে ইহাকেও আধুনিকেরা বাহিরে অস্বীকার না করিলেও অন্তরে অস্বীকার করেন ; কারণ ইহার মধ্যেও তাহারা আধ্যাত্মিকতার দুর্গন্ধ পাইয়া থাকেন। কিন্তু এই জিনিষটিকে বাদ দিয়া তাহারা কিছুতেই বাঁচিতে পারিবেন না। তা' ছাড়া, "সত্য" আধ্যাত্মিক বস্তু নহে, একেবারে খাঁটি বিজ্ঞান, সর্বোচ্চ লজিক,—যে র‍্যাশনেলিজ্‌মের আমরা বড়াই করি তাহারই সার। যে 'ল' বা আইন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহার অনুসন্ধান ও নির্ণয়ই বিজ্ঞানের কাজ। সেই আইন সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্তই সত্য। সৌরজগতে যখন জড় ও সূক্ষ্ম, matter ও spirit দুই-ই রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি, তখন শুধু 'ফিজিক্‌স'কেই বিজ্ঞান বলিব, মেটা-ফিজিক্‌সকে বলিব না এবং দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক সত্যকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিব, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এই অন্যায় অস্বীকৃতির মধ্যেই শুধু ধনতন্ত্রের নহে, সমাজতন্ত্রের বিরাট কীর্তির বিনাশের বীজও উপ্ত হইয়া আছে। এতকাল ইহাদের বাহিরের বিস্ময়কর সৃষ্টি-মাহাত্ম্যই বিহ্বল হইয়া দেখিয়া আসিয়াছি, এখন তাহারই আত্মহত্যার ততোধিক ভয়াবহ আয়োজন সন্ত্রস্ত হইয়া

দেখিতেছি। শুধু আদর্শ-মাহাত্ম্যের জোরে নিজের আইন নিজে তৈরি করিয়া, বিশ্বের মূল নীতির সহিত অসহযোগ করিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়িতে গেলে আদর্শ রক্ষা হওয়া কঠিন।

দুনিয়ার উৎপীড়িত বঞ্চিতদের মুক্তি-সাধন গান্ধীজীরও আদর্শ, জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তাহার জন্য "সত্য" ও "অহিংসা" ভিন্ন তাঁহার আর কোন অস্ত্র বা অবলম্বন নাই। সম্পূর্ণ নির্লোভ, নির্বিত্ত, নিষ্ক্রোধ ও নিষ্কাম হইয়া আত্মশুদ্ধি দ্বারা তিনি আজীবন এই অস্ত্রেই শাণ দিতেছেন। ইহা হইতে এই সার সত্যটুকু তিনি বুঝিয়াছেন যে, সৃষ্টিপ্রবাহকে মানুষের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট খাদে ধরিয়া রাখা যায় না—এই সৃষ্টি-প্রবাহ পণ্ডিতদের বিশুদ্ধ থিওরি বা নির্ভুল ফর্মুলার বাধ্য নহে। তিনি দেখিয়াছেন, জাগতিক বিধানে (ঈশ্বরের বিধান বলিব না) আলোর সহিত অন্ধকার, সত্যের সহিত অসত্য এবং অমৃতের সহিত মৃত্যু মিশিয়া রহিয়াছে। এককে বাদ দিয়া অপরের চিন্তা করা যায় না। কিন্তু মানবের চিরন্তন প্রার্থনা, শাশ্বত অভিযান চলিয়াছে, অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে। অন্ধকারকে, অসত্যকে, মৃত্যুকে গলা টিপিয়া আমরা একেবারে মারিয়া ফেলিতে পারি না ; কিন্তু তাহাদিগকে নির্বিষ করিয়া অমৃতসিক্ত করিতে পারি। এবং তাহা করিতে পারি বলিয়াই আজও সৃষ্টি টিকিয়া আছে। হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহ বাহিরে হুঙ্কার করিয়া আত্মপ্রচার করিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহারাই জগৎ-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে প্রধান নহে, সংখ্যা গরিষ্ঠও নহে। তবে সম্প্রতি ইহাদের উৎপাত অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনীর এবং জার্মানী ও ইটালীর শোকাবহ

পরিণাম দেখিয়া ইহাদের অবিলম্বে সতর্ক হওয়া দরকার। অন্যথা পরের অঙ্কে এবারকার বিজয়ীদের পালা। দেয়ালের লেখা অতি পরিষ্কার। [ইহা লিখিতে না লিখিতে বিজয়ী চার্চিলের দলবল সহ পতন !]

এই ধ্বংশের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই গান্ধীজির আবির্ভাব। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, গান্ধীজির সত্য ও অহিংসা ভিন্ন কোন অস্ত্র নাই। সুতরাং ধনীকে মারিয়া কাটিয়া নিঃশেষ করিয়া গরীবকে সেই ধন দান করিবারও কোন অভিপ্রায় নাই। সেই দানে তিনি বিশ্বাস করেন না। ইহা এক অন্যায় হইতে অন্য অন্যায়ে, এক জুলুম হইতে অপর জুলুমে মানুষকে টানিয়া লইয়া যায় এবং অন্যায় বাড়িয়াই চলে। কিন্তু গরীবের দুঃখ-হরণ তাঁহাকে করিতে হইবে—তাহাই তাঁহার জীবনের ব্রত। কিন্তু বলই যদি প্রয়োগ না করিবেন তাহা হইলে ধনী মহাপুরুষেরা যে শুধু গান্ধী-মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াই তাহাদের সর্বস্ব গরীবের জন্য বিলাইয়া দিবেন, ইহাও ত উন্মাদ ভিন্ন আর কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। অতি সত্য কথা। কিন্তু গান্ধীজীর শক্তি নাই, কিংবা গান্ধীজী শক্তি প্রয়োগ করিবেন না, এই কথা কে বলিল? এই কপর্দকহীন নিরস্ত্র অহিংস ব্যক্তি যদি সত্যই শক্তিহীন তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শস্ত্রশালী ইংরেজজাতি পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কেন এবং ভারতের অবিসম্বাদী নেতা হিসাবে তাঁহাকে ডাকিয়া সন্ধি ও আপোসের আলোচনাইবা করিতে ব্যগ্র হন কেন? তাঁহার শক্তি অতি মারাত্মক শক্তি—বাহিরে কাটে না, ভিতরে জখম করে ও দুর্বল করে। আমরা সেই শক্তিকে আজও ভাল করিয়া চিনি না;

চিনিতে চেষ্টা করি না। সেইজন্যই তিনি আমাদের জন্য আজও জয়মাল্য আনিয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু পরাজয়ও তাঁহার হয় নাই; কারণ সত্যের পরাজয় নাই। তিনি অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছেন। প্রতিপক্ষ তাই জিতিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। পাশবিক শক্তিকে তাহারা জানে, তাহার বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দচিত্তে লড়িতে পারে, জয়লাভে একটা বিজাতীয় উল্লাস পায়। কিন্তু গান্ধী-সেনাদের উপর গুলি চালাইয়া, ইহাদিগকে জেলে পূরিয়া প্রাণে শান্তি

তার উপর আজকাল পৃথিবীর লোকগুলিও যেন কেমন য়াছে! গান্ধীজি, জহরলালদের জন্য তাহাদের আবার মাঝে াঝে মাথাব্যথা উপস্থিত হয়। অনধিকার চর্চা করিতেও ছাড়ে না।

অহিংসা বা আত্মিক বলের অমোঘ শক্তির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তৎ-সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে চান তাঁহারা যন গান্ধীজির "Non-Violence in Peace and War" ও মন্যান্য পুস্তক* পাঠ করেন। আমরা শুধু ইহাই জানাইয়া রাখিতে াই যে, "Non-violence is the summit of bravery"—াান্ধীজির এই কথাটাকে ভাল করিয়া যাচাই না করিয়া আমরা মামাদের ষড়-রিপু-সম্মোহিত বুদ্ধির অহমিকায় যেন ইহাকে পূর্বাহ্ণেই ারাসরি বরখাস্ত করিয়া না দেই।

"Non-violence is not passivity in any shape or form. Non-iolence, as I understand it, is the most active force in the world. ts hidden depths sometimes stagger me just as much as they tagger fellow workers."

---

* A Discipline for Non-violence by Richard Gregg, Practical Non-olence by K. G. Mushruwala.

ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামশীল, সত্যাশ্রয়ী, নিরস্ত্র বীরের অভিজ্ঞতা-প্রসূত উক্তি,— ফাঁকা বাহ্যাড়ম্বর নহে।

মূল বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাক্। সত্য কখনো কামান-বন্দুকে ধার ধারে না। বল প্রয়োগ করিয়া কাজ হাসিল করিতে গেলে তখনকার মত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী ফললাভ হয় না। তাই গান্ধীজির শাস্ত্রে পথ ও লক্ষ্য ভিন্ন জিনিষ নহে, একই বস্তু। সেখানে "Ends justify the means" এই নীতি সম্পূ। অচল। গান্ধীজির ভাষায়ঃ

"There is no wall of separation between means and ends..... Realisation of the goal is in exact proportion to that of the means."

"সত্য" লইয়া গান্ধীজির আজীবন গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত হইতেছেঃ

"Permanent good can never be the outcome of untruth an violence"

তাই গান্ধীজি পাশবিক বল প্রয়োগ করিয়া স্বাধিকারবাদ কিংবা স্বকীয়বৃত্তিকে (private property and private enterprise-কে) ধ্বংশ করিতে উদ্যত হন নাই। ইহার অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ করিবার জন্য বিশ্বের ঘুমন্ত বিবেককে তিনি জাগ্রত করি- চাহিয়াছেন। ইহার জন্য ধনীর দয়া বা অনুগ্রহের আবশ্যক ন. তাহাদিগকে গলা টিপিয়া মারিবারও প্রয়োজন নাই। কারণ গান্ধীজির এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে,

"No person can amass wealth without the co-operat willing or forced, of the people concerned. The moment labo

recognises its own dignity, money will find its rightful place, i.e. it will be held in trust for labour. For labour is more than money."

তিনি আরো বলেন :

"If capital is power, so is work. Either power can be used destructively or creatively. Either is dependent on the other. Immediately the worker realises his strength, he is in a position to become a co-sharer with the capitalist, instead of remaining a slave."

ইহার জন্য বোমা ও পিস্তল ছুঁড়িবার আবশ্যক হইবে না, আমাদের হাত দুটি একটু গুটাইয়া লইলেই আপনি কর্মসিদ্ধ হইবে। প্রশ্ন হইবে, এই ইচ্ছা জাগান যাইবে কোন উপায়ে? উহাদের এজেন্টরা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবে যে! কাহার পথরোধ করিবে, কোন অপরাধে পথরোধ করিবে? কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ লইয়া দল পাকাইয়া আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছি না; নির্লোভ, নির্ভীক, সংযত ও অহিংস হইয়া আমরা গ্রামে বসিয়া আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে চাহিতেছি। অপরাধ কোথায়? আর ইহাও যদি অপরাধ হয়, তবে কত লোককে বিনা অপরাধে বিনা বিচারে জেলে ভরিবে? ... বৎসর পূর্বে 'স্বরাজ' শব্দ মুখে আনিতে লোকে ভয় পাইত! আজ বৃটিশ-সাম্রাজ্যের বহির্ভূত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী লোকের মুখে মুখে, কাগজের ছত্রে ছত্রে। শাসকের হয়ত ইহা অসহ্য। কিন্তু কত মুখ বন্ধ করিবে? কত লেখনী থামাইবে? দেখিতে দেখিতে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য লেখনীর সৃষ্টি হইয়া গেল যে। যেখানে প্রকৃত

অপরাধ নাই, পাপ নাই, পরন্তু অন্যায় ও অধর্ম যেখানে অপর পক্ষে, সেখানে সত্য ধীরে ধীরে আপনার নিয়মে আপনি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার পশ্চাতে কত দারোগা কত দিকে দৌড়াইবে? মোট কথা, যাহারা বিশ্বাস হারাইয়াছে, সত্যের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে যে শক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। এই আধ্যাত্মিক সত্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে স্বীকার করিবার দিন আজ আসিয়াছে। সেইজন্যই গান্ধীজি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বলপূর্বক বেদখলে (expropriation-এ) বিশ্বাস করেন না। ধনীকে দেশের ট্রাষ্টি হিসাবে তাহাদের ধন ব্যবহার করিবার একটা সুযোগ তিনি প্রথমে দিতে চান। তাঁহার সেই সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সব গচ্ছিত ধন সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইবে এবং ধনীর অবস্থা হইবে আদালত নিয়োজিত ট্রাষ্টীর মত। শুধু জনমতের নিকট নহে, আদালতের আইনের নিকট তিনি দায়ী থাকিবেন 'তাঁহার' ধন সম্পত্তির হিসাব নিকাশের জন্য। যদি তিনি তাঁহার অর্থ সাধারণের হিতার্থে ব্যয় না করিয়া নিজের ভোগবিলাসে অপব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ট্রাষ্টীপদ হইতে বরখাস্ত করা হইবে। অবশ্য যতদিন তিনি সদ্ভাবে চলিবেন ততদিন তিনি সম্পত্তির বা কারবারের লভ্যাংশ হইতে শতকরা ৫৲।৬৲ টাকা তাহার নিজ খরচ বাবদ পাইবেন। গান্ধীজির প্ল্যানে সর্বোচ্চ আয় সর্বনিম্ন আয় হইতে ১২ গুণ অপেক্ষা অধিক হইতে পারিবে না। [সোভিয়েট রুশিয়ায় ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ আয় সর্বনিম্ন আয় হইতে অনেক ক্ষেত্রে ৮০ গুণ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!] যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার এ দেশের ধনীরা

না করে তাহা হইলে যে শক্তি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে, তাহা নিশ্চয়ই দেশের ধনীদেরও সহজেই দমন করিতে পারিবে। আর বৃটিশ রাজ যদি পূর্ণ শক্তিতে আত্মনিয়োজিত ট্রাষ্টী হিসাবে বলপূর্বক এই দেশে বিরাজ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই সব দেশী ধনীদের ধ্বংশের কথা অবান্তর। যদি কোন কম্যুনিষ্ট ইংরেজ শাসন দেশে বজায় রাখিয়া দেশের ধনিকদের পৃথকভাবে প্রথমে ধ্বংশ করিতে চায়, আর প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ইংরেজকে পরে তাড়াইবে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর এজেন্ট, মস্কোর মুখোস পরিয়া গরীব ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে।

গান্ধীজি বাস্তববাদী (অথচ তাঁহাকেই স্বপ্নবিলাসী বলা হয়); তাই সমাজ-তন্ত্রের মত অসম্ভব কল্পনা তিনি করেন নাই। "I cannot picture to myself a time when no man shall be richer than another. Even in a most perfect world, we shall fail to avoid inequalities, but we can and must avoid strife and bitterness." সেইজন্যই তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, সমবণ্টন (equal distribution) তাঁহার আদর্শ হইলেও সেই আদর্শে পৌঁছান সম্ভবপর হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। তাই সঙ্গত বণ্টনের (equitable distributionএর) জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। গান্ধীজির পরিকল্পনানুযায়ী বৃহৎ যন্ত্র সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সাধিত হইলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, কাহারো পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা কিংবা বিপুল ধন-সঞ্চয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনাই

তিরোহিত হইবে। তখন শ্রমিকেরা মালিকের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে গৃহে বসিয়া আপন যন্ত্র সাহায্যে সৃষ্টির আনন্দলাভ ও জীবিকার উপায় করিতে পারিবে। তখন আর লক্ষ লক্ষ লোককে খুন করিয়া সমস্ত স্বকীয় সম্পত্তি শক্তিশালী এক-নায়কাধীন রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়া খাওয়া-পরার বিনিময়ে সেই পুরাতন যন্ত্র-দাসত্ব করিতে হইবে না; "ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্ব পীত্বা সুখী ভব"—এই আশীর্বাদের লোভে পড়িয়া "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" প্রেতাত্মা হইতে হইবে না। এবং গান্ধীজির সঙ্গত বণ্টনের আদর্শ সফল হইবে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে গান্ধীজি স্বাধীন কর্মোদ্যম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private enterprise and private propertyর) বলপূর্বক বিলোপ সাধনের বিপক্ষে, তিনিই জনসেবাব্রত আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালে প্রথমেই সর্বপ্রকার বিষয় সম্পত্তি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়াছিলেন—নিজের বা পরিবারের নামে কপর্দক মূল্যের সম্পত্তি রাখেন নাই! অনেকেই হয়ত একথা জানেন না; কিংবা জানিলেও বিস্মৃত হইয়া আছেন। অতি সংক্ষেপে তাঁহারই ভাষায় তাঁহার এই সঙ্কল্প ও সাধনার কথা বলিলে বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"When I found myself drawn into the politica coil, I asked myself what was necessary for me in order to remain absolutely untouched by immorality, by untruth, by what is known as political gain. * * *

I came definitely to the conclusion that if I had to serve the people in whose midst my life was cast and whose difficulties I was witness from day to day, I must discard all wealth, all possession."

আত্মীয়ের ও নিজের সহিত দিনের পর দিন সংগ্রাম করিয়া যখন একে একে স্থাবর-অস্থাবর সর্বপ্রকার বিষয়ের উপর তিনি তাঁহার স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন, সেইদিন তাঁহার কি আনন্দ! "I felt that I could now walk with ease and do my work also in the service of my fellow-men with great comfort and still greater joy. The possession of anything then became a troublesome thing and a burden." নিজের নামে একখানা বীমাপত্র ছিল; কিন্তু তাহাও ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অনাস্থা সূচনা করে বলিয়া বাতিল করিয়া দেন! গান্ধীজির অপেক্ষা সত্যকারের সোশ্যালিষ্ট বিশ্ব-ইতিহাসে কয়জন জন্মিয়াছেন! তাও সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী নহে, ঘোর বিষয়ী—যদিও পরার্থে! আপনি আচরি ধর্ম জগতে শিখায়—রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার চরম দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। বলপ্রয়োগপূর্বক ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নৈতিক অধিকার তাঁহার অপেক্ষা অধিক আর কাহার থাকিতে পারে? এবং তাহা স্বেচ্ছায় জাতির কল্যাণে সর্বসাধারণের হিতার্থে উৎসর্গ করিবার দাবীই বা তাঁহার ন্যায় আর কে করিতে পারেন? তারপরেও সেই দাবী উপেক্ষিত বা অবহেলিত হইলে অহিংস শক্তির অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগে তাঁহাকে

তখন কে বাধা দিতে পারে? কারণ সে সংগ্রাম তখন অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের,—অধর্মে ও অধর্মে এবং অসত্যে ও অসত্যে নহে।

পরিশেষে গান্ধীজির বক্তব্য এই যে, ধনী কর্তৃক মূলধনের অপব্যবহার, এই আবিষ্কার হইতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যদেশে সমাজ-তন্ত্রের আবির্ভাব এই ধারণা সত্য নহে। ইহার সহস্র ২ বৎসর পূর্বে ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে এই তত্ত্ব প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার হইয়াছে,—সমাজ-সংস্কারকগণ নৈতিক বলের সাহায্যে মানব-চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে যখন তাঁহাদের আস্থা হারাইলেন, তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্র নামে এই নূতন সমাজ-তন্ত্র জন্মলাভ করিল। যদিও জগতে পশুবৃত্তি ও পশুবল আছে ও সম্ভবত থাকিবে, তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই, তথাপি ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য ও বলশালী নৈতিক শক্তির উপরে মানব-সমাজের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে কোন আদর্শ, কোন তত্ত্ব, বা 'ইজ্‌ম', এমন কি 'বিজ্ঞান'ও টিকিবে না শেষ পর্যন্ত। সেইজন্যই গান্ধীজির আবির্ভাব এবং গান্ধীজির ভারতীয় সমাজ-তন্ত্রের প্রয়োজন।